যাঁহাতে অবস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখ ও আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না—সেই পরম বরেণ্য জ্যোতি আত্মজ্যোতিতেই বিরাজ করে। আত্মজ্ঞানের ন্যায় পরম পুরুষার্থ জীবের আর কিছুই নাই। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এক আত্মজ্ঞানেই নিহিত রহিয়াছে। আত্মাই আমাদিগকে সেই পরম নিরবদ্য নিরঞ্জন স্বরূপে লইয়া যায়। এক কথায় বলিতে গেলে, আত্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের চরম ফল। যেহেতু আত্মজ্ঞান দ্বারাই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। অতএব আপনাকে জানিতে ইচ্ছা কর। শাস্ত্রে যাহাকে জীবাত্মা বলে, ব্যবহারতঃ আমরা তাহাকে আমি বলি। জীবাত্মা জ্ঞান স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, এক ও অমর ইত্যাদি বলিতে গেলে, আমি জ্ঞান স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, এক ও অমর বুঝায়। আমরা প্রতিপাদন করিব যে পরিমিত ভাবে আমি জ্ঞান স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, শক্তিমান্, আশ্রয় ও নিয়ন্তা। যখন সেই ভূমার দিকে তাকাই, যখন সর্ব্বনিয়ন্তা পূর্ণমঙ্গলস্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান, জ্ঞানময় পিতার দিকে তাকাই, তখন আপনাকে অল্পশক্তিমান্, অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট, অল্পমঙ্গলস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। তখন আপনাকে কীটস্য কীট, সাগর সৈকতে বালুকণা, পামর নরাধম বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বরজ্যোতি পরমাত্মজ্যোতি যখন হৃদয়ে বিরাজ করে, তখন আমি কিছুই নহি, পরমাত্মা সর্ব্বস্ব এইরূপ আমাদের বোধ হয়। সূর্য্য চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র, অগ্নি, বায়ু দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁহার শক্তির পরিচায়ক—হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ আদি এই পরিমিত ভৌতিক শক্তি লইয়া আমার কি তাঁহার সহিত তুলনা হয়? যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এককালে প্রত্যক্ষ করিতেছেন—সহস্র সহস্র, কোটি কোটি বৎসরও যিনি মুহূর্ত্তের ন্যায় অবলোকন করেন, তাঁহার নিকট বুদ্ধি যাহা দুদিন ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারে না—আমার স্মরণশক্তি যাহা গত দিনের সমুদায় মনোভাবের কথা বলিতে পারে না—এই বুদ্ধি ও স্মরণশক্তিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব যে আমি, আমার কি তুলনা হয়? তিনি পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত, আমি বিষয়-ভাবনা দ্বারা সীমাবিশিষ্ট জ্ঞানে অবস্থান করিতেছি। তিনি পূর্ণমঙ্গল সদানন্দে, ধর্ম্মভাবে বিরাজমান, কিন্তু আমার আনন্দ সহস্র সহস্র দুঃখ দ্বারা পরিমিত, আমার ধর্ম্মভাব কামক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দ্বারা সীমাকৃত। মূল কথা, পরম পিতার সহিত আমাদের তুলনা কোনও মতে হইতে পারে না। আমরা তাঁহার সৃষ্ট, সৃষ্ট বস্তুর সহিত স্রষ্টার উপমাই নাই। আমার যে কোন শক্তি আছে—আমি নিজে যে কিছু, সকলেই তাঁহার সম্পত্তি। তাঁহার প্রসাদে আমি জ্ঞানবান্ হইয়াছি, দেহ-মন-বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়াছি; তাঁহারই অজস্র করুণা-বারি দিনে নিশীথে ভোগ করিয়া আমি জীবিত রহিয়াছি। তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত নিজ ইচ্ছায় আমি ক্ষণকাল জীবিত থাকিতে পারি না—আমি নিজে নিজেরই নহি—আমি তাঁহারই। তিনিই আমার সর্ব্বস্ব ধন। এইরূপে পরমাত্মার দিকে তাকাইলে আপনাকে নিতান্ত অকিঞ্চন বলিয়া বোধ হয়, কিছুই নহি এই জ্ঞান হয়। তবে পূর্ব্বে যে জীবাত্মা বা আমি জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলময়, স্বাধীন স্বতন্ত্র অমর ও এক ইহা বলিয়াছিলাম, সেই পূর্ণ স্বরূপের কণামাত্র আমাতে বিরাজিত রহিয়াছে বলিয়াছিলাম—তাহা কাহার সম্বন্ধে? কাহার সহিত সম্বন্ধ রাখাতে এই জ্ঞান আমাদের উদয় হয়? না

জড় জগতের সম্বন্ধে আমরা স্বাধীন, জ্ঞানময়, শক্তিমান্। আমি জড় নহি আমি জ্ঞান, আমি অধীন নহি আমি স্বাধীন ইহা জানিতে গেলে জড়ই বা কি এবং অধীনতাই বা কি ইহা জানা আবশ্যক। জ্ঞানস্বরূপ বুঝিতে গেলে জড়স্বরূপ বুঝা আবশ্যক। কারণ পরস্পর ভিন্ন বস্তু না জানিলে আমরা কোন একটী বস্তু জানিতে পারি না। ভেদজ্ঞানই জীবজ্ঞানের ক্রম। বিচার ভেদজ্ঞান লইয়াই সম্পাদিত হয়। অতএব জড় কি? বস্তুর স্বরূপ আমরা জানিতে পারি না। গুণ সকল দ্বারাই বাহ্য পদার্থ আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। নতুবা বস্তু কি তাহা আমরা জানি না। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে জল কি বস্তু? তবে তাহাকে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে যাহা দেখিতে তরল, ত্বকেতে যাহার শৈত্য গুণ উপলব্ধি করি—জিহ্বাতে যাহার আস্বাদ, না কটু না তিক্ত বলিয়া বোধ হয়—যদ্দারা আমাদের পিপাসার শান্তি হয়, এই সকল গুণ যাহাতে আছে তাহাই জল। কিন্তু ঐ বস্তুটী যে কি তাহা বুঝাইতে পারি না। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমরা রূপ, রস, গন্ধাদি বাহ্য পদার্থের পাঁচটী গুণ জানিতে পারি। এই পাঁচ প্রকারের গুণ ব্যতীত এসংসারে বাহ্য পদার্থের আমরা কিছুই জানিতে পারি না। অতএব জড় কি? না যাহার রূপ আছে, রস আছে, গন্ধ আছে, যাহা আমাদের নিকট পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশিত হয়, যাহা দেশে ও কালে অবস্থান করে অর্থাৎ স্থান ব্যতীত যাহা থাকিতে পারে না, যাহার জন্ম মৃত্যু বৃদ্ধি হ্রাস আছে, যাহা নিজের সম্পত্তি নয় পরন্তু অপরের, যাহার নিজের কার্য্য নাই—যাহা এক অন্ধশক্তির বশীভূত হইয়া সমুদায় কাজ করে; তাহাই জড়। কিন্তু আমি কি? আমি কি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশিত হইতেছি—কালের পরাক্রমে আমি কি পরিবর্ত্তিত হইতেছি, যে স্থানে থাকি সেই স্থানেই কি আমি বদ্ধ; আমি কি নিজ ইচ্ছায় কোন কাজ করিতে পারি না? সকলেই বলিবেন যে জড়ের ন্যায় ঐ সমুদায় গুণাক্রান্ত আমরা নহি। আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশিত হই না। স্থূলদর্শী মনুষ্যেরা আমার রূপ দেখে, আমার শরীরের অবয়ব দেখিয়া আমাকে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত দ্রব্য মনে করে, আমার শব্দ শুনে কিন্তু বাস্তবিক কি আমি তাহা? কখনই নয়। শরীর আমার ভোগসাধনের যন্ত্র মাত্র—আমি শরীরবিশিষ্ট কিন্তু শরীর আমি নহে। জড়জগৎ সম্বন্ধে আমি শরীরে বদ্ধ কিন্তু আমার সীমা নাই। উপরে অসংখ্য অসংখ্য গ্রহতারাপূরিত সৌরজগৎ—নিম্নে বিশাল পর্ব্বত নদনদী বন উপবন পূরিত প্রকাণ্ড পৃথিবী এ সমুদায়ই আমি মনে আয়ত্ত করিতে পারি—যে স্থলে থাকি আমি কেবল সেই স্থলের ভাবনা ভাবি না—সার্দ্ধ ত্রিহস্ত দেহে অবস্থান করিয়া আমার মন অসীম ধারণা করিতে যায়। অত্যুচ্চ পর্ব্বত দেখি, বিশাল সমুদ্র দেখি, বহু বিস্তীর্ণ দেশ মহাদেশ দেখি এবং সকলি মনে ধারণা করিতে পারি—সকলেরই সীমা আমার মন করিতে পারে কিন্তু আমার সীমা কোথায়? কে জানে কে জ্ঞানে আয়ত্ত করিবে, অতঃপর আমি কোথায় বিরাজ করিব, আমার শেষ কোথায়? জড় আমাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না—একমাত্র সেই পরমাত্মা ব্যতীত আমার সীমা নিরূপণ এই জড় জগৎ

করিতে পারে না। স্থূলদর্শী লোকেরা মনে করে যে আমি আমার দেহ—আমি আমার চক্ষু—আমি আমার কর্ণ! কিন্তু বাস্তবিক আমি চক্ষু ও নহি, কর্ণ ও নহি এবং দেহ ও নহি। যাহা কিছুতে আমি আমিত্ব স্থাপন করি তাহা হইতে আমি ভিন্ন। আমি আমার সম্বন্ধীয় বিষয় হইতে পৃথক। আমি কি আমাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারিতেছি? চক্ষু আছে বলিয়া কি আমি জানিতেছি যে আমি আছি? কখনই না। কারণ তাহা হইলে অন্ধকারে যখন চক্ষু দেখিতে পায় না, সূর্য্য চন্দ্র যখন বিরাজ করে না তখনও আমি কি প্রকারে জানিতে পারি যে আমি আছি? অন্ধ লোক আপনাকে আপনি দেখিতে পায় না তথাপি সে কিরূপে জানে যে আমি আছি। আমি কে কখন দেখেও নাই এবং শুনেও নাই। আমি চৈতন্য স্বরূপ ও নিরাকার। কে কোথায় আমার ইচ্ছাকে দেখিতে পাইয়াছে বা শুনিতে পাইয়াছে—আমি নিজেও আমার ইচ্ছাকে দেখি নাই বা শুনি নাই, তথাপি চৈতন্য দ্বারা তাহার সত্তা অনুভব করিতে পারিতেছি। আমি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। নিজ জ্ঞানেই আমি জানিতেছি যে আমি আছি। পরন্তু ইন্দ্রিয়গণ আমার সত্তাতেই সত্তাবান্, আমি এই দেহে আছি বলিয়াই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত রহিয়াছে। যত ক্ষণ দেহেতে আত্মা থাকে ততক্ষণই চক্ষু দেখিতে পায়, কর্ণ শুনিতে পায়। আত্মাবিযুক্ত মৃত দেহে কর্ণ শুনিতে পায় না—চক্ষু দেখিতে পায় না। দেহেতে যে চৈতন্য আপাদমস্তক বিরাজ করিতেছে—দিবারাত্রি বিরাজ করিতেছে—সেই চৈতন্যই আমি। কিন্তু আমাদের যে এই চৈতন্য ইহা ভাব দ্বারা পরিমিত। বিষয়চিন্তা দ্বারা চৈতন্য পরিমিত। বিষয়ভাবনা ছাড়া চৈতন্য স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। তথাপি অনেক পরিমাণে যখন মন হইতে বিষয়চিন্তা দূর করা যায় তখন চৈতন্যে আমি অবস্থান করিতে পারি। মনে ইচ্ছা, ক্রোধ, আশা ভয় ইত্যাদি ভাবপুঞ্জ উদয় ও অস্ত যাইতেছে—ক্ষণপরিমিত কাল তাহারা স্থায়ীও সত্য কিন্তু চৈতন্য নিত্যস্থায়ী। যে ভাব বা যে ইচ্ছা মনে উদয় হইতেছে চৈতন্য জাগরিত থাকিয়া তাহা জানিতেছে—চৈতন্য এই দেহের, এই মনের, ও এই বুদ্ধির ভিত্তিভূমি। মনে সুখ বা দুঃখ স্থায়ী থাকে না, ভয়ের কারণ নিত্য থাকে না—আশাও নিত্য থাকে না কিন্তু আমি বা চৈতন্য নিত্য থাকে। এই জীবনে কতবার কত ভয় পাইয়াছি—কত দুঃখ পাইয়াছি—কতবার মনে হইয়াছে দুঃখেতে বা ভয়েতে জীবন যাইবে কিন্তু সে সব ভয় বা দুঃখ মনেতে কিছুই থাকে নাই—কেবল চৈতন্যই চির বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি নিত্য প্রকাশিত। জাগ্রত কালে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আমি বাহ্য পদার্থ জানিতেছি। স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গণবিরহিত হইয়া দেহজ্ঞানবিরহিত হইয়া—জড় জগতের জ্ঞানবিরহিত হইয়াও আমি কল্পনাতে বিষয় জানিতেছি—সুখ দুঃখ জানিতেছি—দেহজ্ঞানবিরহিত হইয়া, জগৎবিরহিত হইয়া স্বপ্নেও আমি অবস্থান করিতেছি। এবং সুষুপ্তিকালে—যখন জড় জগৎ জ্ঞানেতে প্রকাশিত হয় না—দেহের সত্তা জানিতে পারি না—যখন পিতা মাতা পুত্র কলত্র ইত্যাদি ইহ সংসারের কোন কল্পনাই মনে উদয় হয় না—যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অবস্থান করি—তখনও আমি দেহের অতীত

হইয়া, মনের অতীত হইয়া, জড় জগতের অতীত হইয়া অবস্থান করি। জাগ্রত বা স্বপ্নকালে চৈতন্য বিষয় বিশেষের ভাবনায় বদ্ধ থাকে, তাহাদিগকেই অবলম্বন করিয়া থাকে কিন্তু সুষুপ্তিকালে সে বিষয়াতীত হইয়া আত্মার অবলম্বন পরমাত্মাতে সুপ্তের ন্যায় অজ্ঞান ভাবে লীন থাকে। দিনই বল, মাসই বল, পক্ষই বল এই তিন অবস্থা ব্যতীত চৈতন্যের সম্বন্ধে দিনও নাই, মাসও নাই—বৎসরও নাই। উহা এ তিন অবস্থাতে যেমন অটল ও নিত্য ভাবে বিরাজ করিতেছে—ঈশ্বরপ্রসাদে চিরদিনই সেইরূপ করিবে। অদ্য ইহা আছে—এবং ভবিষ্যতে ও ইহা থাকিবে। আমি জড় জগতের সমুদায় অনিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্য। যদিও এই জড় শরীর পৃথিবীর উপাদানে নির্ম্মিত তথাপি আমার আত্মার গঠন স্বর্গীয় উপাদানে, ইহা পরম পিতার প্রসাদ।

ক্রমশঃ

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

(পৌরাণিক কথার উৎপত্তি।)

আমরা গতবারে সন্ধ্যাপ্রণালীর ভিতর হইতে গায়ত্রী ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে প্রাতঃকালের গায়ত্রীকে ব্রহ্মরূপা মধ্যাহ্নকালের গায়ত্রীকে বিষ্ণুরূপা ও সায়ংকালের গায়ত্রীকে শিবরূপা বলিয়া চিন্তা করিবার ব্যবস্থা আছে। গায়ত্রীধ্যানে এই তিন সময়েই গায়ত্রীকে সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতা এই বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। দেবতাতত্ত্বের মর্ম্মের ভিতরে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মোদ্ভেদ করা বড়ই কঠিন। আমরা এইমাত্র দেখাইয়াছি যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে বেদের ভিতরে সূর্য্যের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে।

ব্রহ্মার কন্যাগমন বৃত্তান্ত পাঠকবর্গ শুনিয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান সময়ে এই ঘটনাকে জনসাধারণে স্থূলভাবে বিশ্বাস করিতে চাহেন, দেবতার লীলা বলিয়া ইহার ভিতরে বড় একটা দোষ দেখিতে পান না। আমরা বলি প্রাচীন ঋষিগণ কি এতই নির্ব্বোধ ছিলেন, যে তাঁহারা এই সকল জঘন্য উপাদান লইয়া দেবচরিত্র নির্ম্মাণ করিতেন। আমরা দেখাইব যে আধুনিক ও পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণের পদস্খলন হইয়াছে, অনেক স্থলে বেদের অর্থগ্রহণে অসামর্থ্য প্রযুক্ত হউক অথবা ইচ্ছা করিয়াই হউক, তাঁহারা আপনাদিগকে ভ্রমে নিপাতিত করিয়াছেন এবং আমাদিগকেও বিপথগামী করিয়াছেন। জনসমাজের আদিম সময়ে বৈদিক ঋষিগণ কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে নৈসর্গিক ঘটনারাজি অবলোকন করিতেন, কবিত্বের আবরণে আলোচ্য বিষয় গুলি বিবৃত করিতেন, তাঁহাদের কোনরূপ কুটিল অভিপ্রায় ছিল না।

প্রভাতে সূর্য্যোদয়ে উষার উৎপত্তি। একারণে একভাবে সূর্য্য বা ব্রহ্মা উষার জনক বা পিতা। অন্যদিকে উষার কোমলতার উপরে সূর্য্যের কিরণ বা তেজ নিপতিত হয় বলিয়া ব্রহ্মা বা সূর্য্যকে উষার স্বামীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মার আর একটি নাম প্রজাপতি। এইজন্য "প্রজাপতিঃ স্বাং দুহিতরং অগাৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মা বা প্রজাপতি আপনার কন্যাতে উপগত হন, বেদে এরূপ উল্লেখ আছে। পৌরাণিক কাহিনী এই কবিত্ব অবলম্বনে রচিত ও পরে অতিরঞ্জিত।

সুপ্রসিদ্ধ কুমারিল ভট্ট একজন মীমাংসাকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ইনি বৌদ্ধবিপ্লবের

সময়ে আবির্ভূত হয়েন। পূর্ব্ববাদী কর্ত্তৃক আপাতপ্রতীয়মান ঈদৃশ বৈদিক ঘটনা সম্বন্ধে কুমারিল জিজ্ঞাসিত হইলেন। তিনি তদুত্তরে বলেন "প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে" প্রজাপালনজন্য আদিত্য বা সূর্য্যের নাম প্রজাপতি। "স চারুণোদয়বেলায়াং উষসমুদ্যন্নভ্যেতি" অরুণোদয় বেলায় উষাকালে সূর্য্য উদিত হন; "সা তদাগমনাদেবোপজায়তে ইতি তদ্দুহিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে" সূর্য্যোদয় সময়ে উষা উৎপন্ন হয় এইজন্য উষাকে, তাহার অর্থাৎ সূর্য্যের কন্যা বলে। "তস্যাং চারুণকিরণাখ্যবীজনিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুষসংযোগবৎ উপচারঃ"। উষাতে অরুণ কিরণরূপ বীজ নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া উভয়ের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ সংহিতায় ২য় অষ্টকের ১২২ ১২৩ ও ১২৪ সূক্ত উষাদেবীর বর্ণনায় পরিপূর্ণ। আমরা ১২৩ সূক্তের দশম ঋক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে কেমন করিয়া ব্রহ্মার কন্যাগমন বৃত্তান্ত কল্পিত হইয়াছে।

কন্যেব তন্বা শাশদানাঁ এষি দেবি দেবমিয়ক্ষমাণং
সংস্ময়মানা যুবতিঃ পুরস্তাদবির্বক্ষাংসি কৃণুষে বিভাতী।

অর্থ। উষাদেবি! কন্যার ন্যায় শরীরাবয়ব বিকাশ করিয়া তুমি দানশীল ও দীপ্তিমান সূর্য্যের নিকট গমন কর। পরে যুবতীর ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্টা হইয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর। নবম ঋকে আছে "উষা দিনের প্রথম অংশের আগমন সময় জানেন তিনি স্বতোদীপ্তা শ্বেতবর্ণা ... ... তিনি আদিত্যের ধামে মিশ্রিত হয়েন"। ১২৩ সূক্তের ২য় ঋকে আছে "সমস্ত ভূতগণের পূর্ব্বে উষা জাগরিত হয়েন ... ... তিনি যুবতী এবং পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়েন।" ১২৪ সূক্তের ৪র্থ ঋকে আছে "গৃহিণী জাগরিতা হইয়া যেমন সকলকে জাগরিত করেন, উষাও সকল প্রাণীকে সেইরূপ জাগরিত করেন, উষা অভিসারিকাগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকবার আগমন করেন। (রমেশবাবুর ঋগ্বেদ) পাঠকবর্গ ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রজাপতির কন্যাগমন বৃত্তান্ত কুমারিল ভট্টের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিবার অধিকার ছিল। বেদের ভিতর হইতে আমাদের মতের পরিপোষক অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া আমরা তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলাম।

সামবেদ সংহিতার মূল ও বাঙ্গালা অর্থ প্রকাশক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী তাঁহার সামবেদের অবতরণিকাভাগে ব্রহ্মার কন্যাগমন বৃত্তান্ত লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন "মনুবংশীয় নাভানেদিষ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত সপ্তবিংশতি ঋকের যে একটি সূক্ত ইদানীং ঋকসংহিতার দশম মণ্ডলে একষষ্টিতম, তাহার সপ্তম মন্ত্রটি এই—

পিতা যৎ স্বাং দুহিতরমধিষ্কন্ ক্ষ্মা রেতঃ সঞ্জগ্মানো নিষিঞ্চন্।
সাধ্যোঽজনয়ন ব্রহ্ম দেবা বাস্তোষ্পতিং ব্রতপাং নিরতক্ষন্

অর্থ। "ব্রহ্ম" ব্রহ্মা নামক প্রসিদ্ধ পিতা "স্বাং দুহিতরং" স্বীয় দুহিতাকে "অধিষ্কন্" আক্রমণ করেন, পরে তাঁহাকে পাইয়া "ক্ষ্ময়া" পৃথিবীতে ... ... "সঞ্জগ্মানঃ" সঙ্গম করত "রেতঃ নিষিঞ্চন" গর্ভাধান করেন। তাহা হইতে 'সাধ্যঃ দেবাঃ' সাধ্য দেবগণ "অজনয়ন" সমুৎপন্ন হইয়াছেন, "ব্রতপাং" ব্রতরক্ষক "বাস্তোষ্পতিং" বাস্তোষ্পতি দেবতাও "নিরতক্ষণ" তাহা হইতেই নির্ম্মিত হইয়াছেন।

তাৎপর্য্য—ব্রহ্মা পর্জ্জন্য দেবতা—মেঘমণ্ডল, স্বীয় দোহনকারিণী পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়া (রেতঃ নিষিঞ্চন) বৃষ্টিপাত করত পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হন। (স্বাধ্যঃ দেবাঃ) স্বাস্থ্যকর দ্যুতিমান অন্ন সকল সমুৎপাদন করেন, (বাস্তোম্পতিং বাস্তু অর্থে গৃহ তাহার পালক) শিংশপা শাল প্রভৃতি কাষ্ঠ তরু, (ব্রতপাং ব্রতশব্দে যজ্ঞ তাহার পালক রক্ষক) যজ্ঞমণ্ডপ নির্ম্মাণের উপযোগী বংশ তৃণাদি নির্ম্মাণ করেন।

নিরুক্তকার বলেন "দুহিতা—দুর্হিতা, দূরে হিতা (দূরে স্থিতা) দোগ্ধে র্বা"। "পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ"। সায়ণাচার্য্য ইহার (ঋগ্বেদ সংহিতা ২, ৩, ২০, ৩) ব্যাখ্যাতে বলেন পিতা দ্যুলোকঃ অধিষ্ঠাত্রধিষ্ঠানয়োরভেদেনাদিত্যো দ্যৌরুচ্যতে, স রশ্মিভিঃ অথবা ইন্দ্রঃ পর্জ্জন্যো বা দুহিতুঃ দূরে নিহিতায়া ভূম্যা গর্ভং সর্ব্বোৎপাদনসামর্থ্যং বৃষ্ট্যুদকলক্ষণমাধাৎ সর্ব্বতঃ করোতি। অর্থাৎ পিতা দ্যুলোক; বাসস্থানের নামানুরূপ বাসকারীর নাম হইয়া থাকে, এজন্য দ্যুশব্দে সূর্য্য। তিনি স্বীয় রশ্মি দ্বারা দূরে স্থিতা সুতরাং দুহিতার—পৃথিবীর গর্ভাধান করিতেছেন। অথবা ইন্দ্র বা পর্জ্জন্য দেব দুহিতৃ স্থানীয় পৃথিবীতে সর্ব্বোৎপাদন-সমর্থ বৃষ্টিজল আধান করিতেছেন"।

সামশ্রমী মহাশয় বলেন "পিতৃ প্রজাপতি ও ব্রহ্মা শব্দে সূর্য্য বা পর্জন্য, এবং দুহিতৃশব্দে উষা অথবা পৃথিবী বুঝিতে হইবে। এই দুই অর্থে বেদের ভিতরে বহুল স্থানে এই কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত।"

ব্রহ্মার কন্যাগমন বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি গল্প রচিত হইয়াছে। "তা মৃশ্যোভূত্বা রোহিতং ভূতা মভ্যেৎ" ইত্যাদি (৩, ৩, ১০,) অর্থাৎ আক্রমণ কালে কন্যা ভীতা হইয়া শীঘ্র পলায়ন করিবার মানসে ঋশ্য নামক মৃগীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাও উক্তরূপ ধারণ করেন। মহিম্নস্তবে তদনুযায়ী নিম্নলিখিত শ্লোকটি আরও একটু অধিকমাত্রায় রঞ্জিত হইয়া রচিত হইয়াছে; এবং মহাদেব যে মৃগরূপিণী কন্যাকে অভয়দান করিয়া তাহার রক্ষার্থ নিজ শরাসন ধারণ করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে।

প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষু মৃশ্যস্য বপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ।

অর্থ, হে প্রভু! প্রজাপতি ব্রহ্মা মৃগরূপিণী আপন কন্যাকে বলপূর্ব্বক রমণ করিতে ইচ্ছুক হইলে, আপনাকে ধনুষ্পাণি দেখিয়া, সেই লম্পট যে ভয় পীড়িত হইয়া স্বর্গলোক হইতে পলায়ন করে এখনও সেই মৃগব্যাধের বেগ আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই। ক্রমে মহাদেবের ধ্যানে "পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং" এই সকল কথার উল্লেখ আসিয়া পড়িল, অর্থাৎ এক হস্তে তাঁহার পরশু (বিনাশের জন্য) অন্য হস্তে (সম্ভবত এই) মৃগ, অন্য এক হস্তে বর (যাচকের জন্য), অন্য হস্তে অভয় (বিপন্নের জন্য)।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল ইহা হইতেই সপ্রমাণ হইবে যে বেদের ভিতরে অনেক স্থানে ব্রহ্মা ও সূর্য্য একই। বিষ্ণু ও যে ঐরূপ সূর্য্যের নামান্তর, তাহাও নিম্নে আমরা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদের ১অষ্টকের ২২সূক্তের ১৬শ ঋক হইতে ২১শ ঋকে বিষ্ণু শব্দের উল্লেখ আছে। নিরুক্তকার যাস্ক এই ১৭শ ঋকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। "যদিদং কিঞ্চ তৎবিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবি

ইতি শাকপূনিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়াশিরসি ইতি ঔর্ণবাভঃ। নিরুক্ত ১২। ১৯। নিরুক্তের এই অংশের উপর দুর্গাচার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করেন; যথা বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি আহ ত্রেধা নিদধে পদং নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। কতৎতাবৎ। পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবি ইতি শাকপূনিঃ। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি, অন্তরীক্ষে বৈদ্যুতাগ্নিনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা ... ... সমারোহণে উদয়গিরৌ, বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেঽন্তরীক্ষে। গয়াশিরস্যস্তগিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্যো মন্যতে। (বাবু রমেশ চন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ এই যাহা কিছু বিষ্ণু পরিভ্রমণ করেন। বিষ্ণু তিন স্থানে পদ নিক্ষেপ করেন। কোথায় কোথায়? শাকপূনির মতে (১) পৃথিবীতে (২) অন্তরীক্ষে (৩) আকাশে। ঔর্ণবাভের মতে সমারোহণে বিষ্ণুপদে ও গয়াশিরে। দুর্গাচার্য্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন বিষ্ণু অর্থে সূর্য্য। শাকপূনির মতানুসারে এই বিষ্ণু কিরূপে পৃথিবীতে অন্তরীক্ষে ও আকাশে পদনিক্ষেপ করেন? পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুতাগ্নিরূপে আকাশে সূর্য্যরূপে। ঔর্ণবাভের মতে বিষ্ণু প্রথম পাদ উদয়কালে উদয়গিরিতে, দ্বিতীয় পাদ মধ্যাহ্ন কালে বিষ্ণুপদে বা অন্তরীক্ষে, তৃতীয় পদ সন্ধ্যাকালে গয়াশিরে অর্থাৎ অস্ত পর্ব্বতে।

এই বিষ্ণুর অর্থাৎ সূর্য্যের তিন পদ নিক্ষেপ লইয়া পুরাণের ভিতরে যে সমস্ত বৃত্তান্ত রচিত হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। অসামান্যদাতা বলিরাজাকে ছলনা করিবার জন্য বিষ্ণু বামনবেশে ঐ রাজার নিকট ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেন। রাজা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। বদান্যতা ও অসামান্য দানশীলতা তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। বলিরাজার দান ব্যাপার দেখিয়া দেবগণের ঈর্ষা জন্মিল। বামনবেশধারী বিষ্ণু এক পদ পৃথিবীতে স্থাপন করিলেন, তদ্দারা সমুদয় পৃথিবী ব্যাপিয়া গেল, তিলমাত্র স্থান রহিল না। আর এক পদ আকাশে স্থাপন করিলেন, সমস্ত আকাশ অন্তরীক্ষ ভরিয়া গেল। তথনও বামনদেবের আর এক পদ ভূমির আবশ্যক। বলিরাজা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তিলমাত্র ভূমি দেখাইতে পারিলেন না। আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া সত্যধর্ম্মা রাজা নিজের মস্তক পাতিয়া দিলেন। রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল বটে, কিন্তু তাঁহার সত্যনিষ্ঠা হইতে তিনি পাতালে প্রবেশ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে দেবতাগণ এই ব্যাপার সন্দর্শনে কাহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং কাহার জয়েই বা দুন্দুভি ধ্বনি করিয়া ছিলেন, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিলাম না।

বৈদিক কবিত্বের সীমা বলিরাজার উপাখ্যানে পর্য্যবসিত হয় নাই। বিষ্ণু নামধারী সূর্য্যের পদনিক্ষেপ অবলম্বনে হিন্দুজাতির এক পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ঔর্ণবাভের মতে বিষ্ণু তিন স্থানে পদনিক্ষেপ করেন। প্রথম পদ উদয় পর্ব্বতে, দ্বিতীয় পদ আকাশের সর্ব্বোচ্চ দেশে, তৃতীয় পদ গয়াশিরে অর্থাৎ অস্তপর্ব্বতে। প্রকৃত পক্ষে প্রভাত হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত সূর্য্যদেবের প্রয়াণ, বেদের ভিতরে চিত্রিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশত পুরাণকার গল্পরচনার এমন অবসর পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। বেহারাঞ্চলে গয়া নামক নগরের অস্তিত্ব দেখিয়াই হউক অথবা গয়া নামক

স্থানের নামকরণ করিয়াই হউক বুঝাইয়া দিলেন যে—এইখানেই বিষ্ণু দেবতা সশরীরে আসিয়া নিজপদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এবং এই বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলে পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার হইয়া যায়। আমরা কিছু পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধের বৈরী নহি। কোন একস্থানে সম্মিলিত হইয়া, জনসাধারণ কর্ত্তৃক পিতৃমাতৃকুলের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন নিন্দনীয় নহে। তবে পৌরাণিক ঋষিগণ স্বকপোলকল্পনা বলে অমূলক কাহিনী যে রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাই সপ্রমাণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সূর্য্যের এক উদয়াস্ত লইয়া পৌরাণিকগণ ব্রহ্মার কন্যাগমন বলিরাজার পাতালে প্রবেশ, গয়াসুরে পিণ্ডদানের অমোঘতা দেখাইয়া গিয়াছেন। ধন্য তাঁহাদের উদ্ভাবনী শক্তি।

গায়ত্রীধ্যানে প্রাতর্গায়ত্রীকে যেমন ব্রহ্মরূপা, মধ্যাহ্নগায়ত্রীকে যেমন বিষ্ণুরূপা তেমনি সায়ংকালের গায়ত্রীকে শিবরূপা বলিয়া ধ্যান করিবার যে বিধি আছে, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখাইয়াছি। এই প্রস্তাবে দেখান হইল যে বেদের ভিতরে অনেক স্থলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সূর্য্যের নামান্তর মাত্র।

আগামী বারের প্রস্তাবে অহল্যা গৌতম সংবাদে প্রতিনিবৃত্ত হইবার আমাদের ইচ্ছা রহিল।

—

ধর্ম্মবীর দিবোদাস।

এদেশের পুরাণশাস্ত্র ঋষিপ্রণীত। ব্রহ্মজ্ঞান যাহা উপনিষদাদিতে আবদ্ধ তাহাই সর্ব্বসাধারণের বোধসুলভ করা এই সকল শাস্ত্রপ্রণয়নের উদ্দেশ্য। যখন লোকসমাজ মোহাচ্ছন্ন হইয়া প্রকৃত সত্যের পথ পরিত্যাগ করে, নানা প্রকার অনাচার অত্যাচারে সকলকে প্রপীড়িত করিতে থাকে সেই অবস্থায় তাহাদিগকে ধর্ম্মে ও সত্যে স্থাপন করিবার জন্য ঋষিদিগকে সময়ে সময়ে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইত। তাঁহারা নানারূপ উপদেশ এবং মহাজনদিগের পবিত্র চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকে শিক্ষা দিতেন। আমরা অদ্য যাঁহার বৃত্তান্ত কাশীখণ্ড হইতে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি ইনি ধর্ম্মবীর দিবোদাস। গ্রন্থকার মহর্ষি মার্কণ্ডেয় স্বগ্রন্থে এই মহাজনের চরিত্রের অবতারণা করিয়া দেখাইয়াছেন যেখানে ধর্ম্ম সেখানে ন্যায় ও সরলতা আর যেখানে অধর্ম্ম সেখানে অন্যায় ও কপটতা। যদি দেবতাদিগের মধ্যেও এই অন্যায় ও কপটতা থাকে তাহা সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। এই মহান উপদেশ ধর্ম্মপ্রাণ দিবোদাসের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে।

কাশীখণ্ডে উল্লেখ আছে যে এক সময়ে কাশীধামে দেবতারা মহাপ্রতাপশালী হইয়া ষোড়শোপচারে পূজা প্রাপ্ত হইতেন। কাশীপতি দিবোদাস তাহা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন যে "কাশীধাম হইতে দেবতারা যথাইচ্ছা প্রস্থান করুন।" রাজাদেশক্রমে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেবতা যথা স্থানে প্রস্থান করিলেন। কেবল মহাদেব কাশী পরিত্যাগে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে দিবোদাস অধিকতর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকেও নির্ব্বাসিত করিলেন। অগত্যা শিব ভবানীর সহিত কাশী পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসে উপনীত হইলেন। পরে এ সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং দেবলোকে দেবসভায় মহা এক আন্দোলন পড়িয়া গেল।

যে সকল দেবতা এতকাল একচ্ছত্রী হইয়া বিশেষরূপে পূজিত হইয়া আসিতে ছিলেন তাঁহারা অভিলষিত পূজা প্রাপ্ত না হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। একদিন দেবগণ সমবেত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন কি উপায়ে তাঁহারা কাশীধামে পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিতে পারেন। পশ্চাৎ সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল, যে, দিবোদাসের কোনও রূপ দোষ দৃষ্ট হইলেই তাহাকে কাশী হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে। অতএব সর্ব্বতোভাবে তাঁহার দোষানুসন্ধান কর। কাশীখণ্ডে কথিত আছে যে দেবতারা সতত তাঁহার দোষানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিয়াও যখন তাঁহার কোনও রূপ কিছু দেখিতে পাইলেন না তখন একে একে সকলেই বিষন্ন মনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ভবানীপতি কাশী পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহতের ন্যায় মনোদুঃখে কৈলাসে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সকলেই কহিতে লাগিলেন কাশীরাজ্য আমাদের চির সম্পত্তি। তাহাতে আমাদিগের স্বত্বলোপ হওয়ায় আমরা যে কেবল হতমান হইয়াছি এমন নহে কিন্তু আমাদের দেবকুলগৌরব মহাদেবের এইরূপ নির্য্যাতন আমাদের সহনীয় হইতেছে না। সুতরাং দিবোদাসের প্রভুত্বগর্ব্ব খর্ব্ব করিতে না পারিলে আমাদের আর উপায় নাই।

ঐ সময় দিবোদাসের প্রচণ্ড প্রতাপে কাশী এরূপে সুশাসিত হইতেছিল, যে কাহারও সাধ্য নাই তাঁহার নিয়মের বিরুদ্ধে একপদ অগ্রসর হয়। তিনি নিজে সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী ও নিরভিমান সুতরাং গর্ব্ব তাঁহার রাজ্যের কোন স্থানেও বসতি করিতে পারিত না। তিনি অতিশয় শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন, ধীর এবং স্থির ভাবে সত্যের আদর ও অসত্যের অনাদর করিতেন। প্রজাদিগের সুখ ও শান্তি বর্দ্ধনের জন্য তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, এবং ভাগ্যক্রমে তাঁহার সহচর অনুচরগণ তাদৃশ সুশীল ও শান্ত হওয়ায়, শান্তি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার রাজ্যে বিচরণ করিত। সুতরাং ধনী নির্ধন, বলী দুর্ব্বল, জ্ঞানী অজ্ঞান, সকলেই মৎসরতাশূন্য হইয়া মাতৃক্রোড়ের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার রাজ্যে বাস করিত। তিনি যাঁর পর নাই নীতিপরায়ণ ছিলেন। জ্ঞান তাঁহার মানদণ্ড, সত্য তাঁহার তুলাদণ্ড, ন্যায় তাঁহার ভূষণ এবং ধর্ম্ম তাঁহার বর্ম্ম ছিল। সুতরাং আত্মপর বিচার না করিয়া চির জীবন সমদর্শী হইয়া অবস্থিতি করিতেন। দিবোদাস মহাযোগী ছিলেন। যেমন সূর্য্যের প্রদীপ্ত কিরণ সমস্ত জগতে সমান ভাবে বিকীর্ণ হইতেছে, চন্দ্রমার সুধামাখা জ্যোৎস্না যেমন সর্ব্বত্র সমান ভাবে পতিত হইতেছে, এবং বসন্তের বিমল বায়ু যেমন সকলের গৃহে সমান ভাবে সঞ্চরিত হইতেছে, দিবোদাসের নীতি ও ন্যায়পরতা সেইরূপ সমানভাবে সর্ব্বত্র বিস্তৃত থাকিত। তাঁহার রাজ্যে কোথাও অশান্তি বিরাজ করিত না। তখন দেবতারা তাঁহার দোষদর্শনে অসমর্থ হইয়া দুঃখাবেগে কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন পুণ্যভূমি কাশীবিরহে শঙ্কর কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তদ্দৃষ্টে তাঁহারা সবিস্ময়ে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনার কৃপার যেমন সীমা নাই করুণারও তেমনি অন্ত নাই,তাই বরাভয়দানে জগতে কতবার আপনি বিড়ম্বিত হইয়াছেন। এখন কোন্ সদুপায় অবলম্বন করিলে আপনি অশী বরুণার মধ্যগত হইয়া কাশীনাথ রূপে পূর্ব্ববৎ বিরাজিত হইতে পারেন, তাহা

স্থির করিয়া বলুন। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও আমরা তাহা সাধন করিতে যত্ন পাইব। তখন কাশীনাথ কাশীধাম পুনঃ প্রাপ্তির আশায় সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেবগণ, তোমাদিগের শুভাগমনে আমি বিশেষ প্রীত হইযাছি, কিন্তু আমার কাশীবাস এক প্রকার দুরাশা হইয়া পড়িয়াছে। দিবোদাস যেরূপ ধার্ম্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ তাহাকে অকারণ অবমানিত করিয়া কাশী হইতে বহিষ্কৃত করা আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু কাশীতে আমাদিগের এতকাল যেরূপ প্রভাব বর্ত্তমান ছিল তাহারও অপলাপ হইতে দেখা যায় পর নাই কষ্টকর বটে। এখন কি উপায় অবলম্বন করিলে দিবোদাসের তুষ্টি সাধন করা যায়, তোমরা তাহাই উদ্ভাবন কর। তখন একে একে সকল দেবতাই মুক্ত কণ্ঠে দিবোদাসের মনস্বিতার এবং ন্যায়পরতার পরিচয় দিয়া কহিলেন, আমরা নানা উপায় অবলম্বন করিয়া বহু যত্নেও তাঁহার কোন একটী ছিদ্র দর্শন করিতে পারি নাই। সে বীর-ধর্ম্মপ্রসূ জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী এবং ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য, সুতরাং কাশী সে সহজে পরিত্যাগ না করিলে তাহাকে কাশীচ্যুত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। ইহা শুনিয়া কাশীবিচ্ছেদে প্রপীড়িত শঙ্কর ভীত হইয়া পড়িলেন। তখন গণদেব সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, যে উপায়ে হউক আমি একার্য্য সাধন করিব। তখন বাত্যাপীড়িত নাবিক যেমন কূল পাইলে আশ্বস্ত হয় দেবগণ সেইরূপ গণপতির বাক্যে আশ্বাস পাইয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গণদেব এক কপট যোগীবেশ ধারণ করিয়া দিবোদাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই স্থলে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ন্যায় ও নীতিকে ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক রাখিবার নিমিত্ত দিবোদাসের শেষ জীবনে যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা অতিশয় বিস্ময়কর। গণেশ কপট যোগীরূপ ধারণ করিয়া কাশীরাজ দিবোদাসের নগরীতে উপস্থিত হইয়া কেবলই তাঁহার দোষানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক পল্লীতে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি কোন দোষের লেশও পাইলেন না। প্রত্যুত দেখিলেন কি শিল্পালয়, কি বিদ্যালয়, কি পণ্যবীথিকা, কি মল্লভূমি, কোথাও শান্তির অভাব নাই। কি রাজদ্বারে কি বিচারালয়ে কি ধর্ম্মমন্দিরে কি শশ্মানে কোথাও ধর্ম্মের বিকৃত মূর্ত্তি সত্যের অসদ্ভাব জ্ঞানের অপ্রাচুর্য্য ও ধনের অভিমান নাই, সর্ব্বত্রই দেখিলেন শান্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। আরো দেখিলেন দেবসভায় যে সকল কুচক্রের আয়োজন হইতেছে,এখানে তাহার কোন আভাস নাই, প্রত্যুত ইহাই প্রতীত হইল যে দিবোদাস অসীম জ্ঞানবলে বলীয়ান থাকিয়া ধর্ম্মের দ্বার সহস্র দিকে উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, স্বপ্নেও কেহ প্রতারণার পক্ষপাতী নহে। বর্ত্তমান কাশী রাজের দরবারে যে প্রবাদ বাক্য লিখিত আছে “নচ সত্যাৎ পরোধর্ম্মঃ” সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর ধর্ম্ম নাই, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দিবোদাসের রাজ্যে গণদেব স্বয়ং তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অনন্তর দিবোদাস রাজবেশে যথায় রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া মহারাজের জয় হউক বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দিবোদাস সেই অলৌকিক রূপসম্পন্ন যোগীবরকে

দর্শন করিয়া ভক্তিগদগদ বচনে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে যথোপযুক্ত আসনে উপবেশিত করিলেন। তাহার পর তাঁহার যথাযথ পূজা সম্পাদন করিয়া কহিলেন ভগবন্! কি উদ্দেশে আপনি এ দাসের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন নিশ্চিন্ত চিত্তে আজ্ঞা করুন। ঐ সরলতার আধার, বিনীত হৃদয়ের বন্ধু, সত্যের আশ্রয় স্বরূপ, নরকেশরী দিবোদাসকে দর্শন করিয়া গণদেব বিমোহিত হইয়া গেলেন এবং প্রহৃষ্ট মনে কহিলেন, মহারাজ! ভাগীরথী তলবাহিনী বলিয়া যেমন কাশীর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, আপনার অসীম ন্যায়পরতাও তেমনি ইহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছে ইহা দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম। আপনি বস্তুতই কেবল রাজকুলের নহেন মনুষ্যকুলের গৌরবস্বরূপ এবং ন্যায় ও ধর্ম্মের আদর্শস্বরূপ। কিন্তু আপনি আর কতকাল এ নশ্বর রাজ্যভার স্কন্ধে ধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিবেন? ঐ দেখুন দীপ্তিময়ী দিব্য ধর্ম্মের অলৌকিক শোভা আপনাকে আহ্বান করিতেছে, পূজাপ্রিয় দেবগণ আপনার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। আপনি কেবল সম্পদের আস্পদ নহেন যশেরও বরণীয়, গৌরবের আধার এবং শান্তির নিত্য নিকেতন। আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমার অনুসরণ করুন আমি আপনাকে দিব্যধামে লইয়া যাই। তখন শান্তপ্রকৃতি দিবোদাসের নশ্বর সংসার ত্যাগের বাসনা হইল। তিনিও যোগীর বেশ ধারন করিয়া কাশী পরিত্যাগ করিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার অনুগত আত্মীয় স্বজন কাশী পুরী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। এই অবসরে দেবগণ পূর্ণমনোরথ হইয়া প্রফুল্ল অন্তরে নিজ নিজ স্থান অধিকার করিলেন। এবং গণদেবও কপট যোগিবেশ পরিত্যাগ করিয়া ঢুণ্ডিগণেশ রূপ ধারণ করত তথায় পরম সমাদরে পূজা পাইতে লাগিলেন।

শাস্ত্রে অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় দেবগণ অনেক সময়ে সংকীর্ণতা প্রকাশ করিয়া লোকের অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। যখন যেখানে কেহ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন সেইখানেই দেবগণ তাহার প্রতি বিরূপ। মহাত্মা নহুস যজাতি বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহাত্মাদিগের কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া তাঁহাদিগের যোগ ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল দেবগণই তাহার মূল, কিন্তু অধ্যবসায়গুণে ধর্ম্মাত্মারা কোথাও পরাস্ত হন না, প্রত্যুত দেবতারাই পরাভূত হন। দেখিতে পাওয়া যায় ন্যায় ও নীতি সত্য ও ধর্ম্মের উজ্জ্বলতর কিরণের সম্মুখে দেবগণের বল বীর্য্য কত ক্ষীণ? দিবোদাসের জীবনেও আমরা তাহাই দেখিলাম। শতবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া যত তাঁহারা দিবোদাসের কর্ম্মভূমিতে বাধা জন্মাইতে লাগিলেন,ন্যায়পরায়ণ দিবোদাস তমোনাশকারী সূর্য্যের ন্যায় ততই তাঁহাদিগের বাধা বিক্রম অতিক্রম করিতে লাগিলেন। দেবতারা পরিশেষে পরাস্ত হইয়া গণদেবের সাহায্যে তাঁহাকে পরাগতির পথ দেখাইয়া আপনারা তাঁহার অর্জ্জিত ধনের উত্তরাধিকারী হইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছল কপটতা দেবহৃদয়ে থাকিলেও সর্ব্বথা তাহা অনাদরণীয়, গ্রন্থকার স্বগ্রন্থে দেবমানবের সঙ্ঘর্ষে তাহাই দেখাইয়াছেন। ফলত যাঁহারা ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া তাহার পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলেন তাঁহাদের জীবন যে কত অসার তাহার দৃষ্টান্ত মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এইরূপে কাশীখণ্ডে

বর্ণন করিয়া যে মহা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহার জন্য জনসমাজ চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

উদ্ভিদ্ রহস্য।

মোমতরু।

পরমপিতা পরমেশ্বর মানবের সুখসংবর্দ্ধনার্থ পৃথিবীতে যে কত প্রকার পদার্থের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? মানবের যতই অভাব বোধ হইতেছে, ততই সে ব্যাকুলভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে এবং অভাব সংপূরণার্থ বিজ্ঞানকে নিয়োগ করিতেছে। মানব বিজ্ঞানালোকে স্বীয় অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইতেছে আর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রশ্ন করিতেছে, কে সেই মহান্ পুরুষ যিনি মানব সন্তানের ভাবী অভাব সংপূরণার্থ পূর্ব্ব হইতে এতটা আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন?

অন্ধকারময় গৃহ আলোকিত করিতে হইবে, কিসের সাহায্যে তাহা সংসাধিত হইতে পারে? যেমনই অভাববোধ, অমনই তাহার সংপূরণার্থ চেষ্টা। অনন্ত প্রকৃতি রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আবিষ্কার তাহার ফল।

আমাদের দেশে মধুচক্র হইতে মোম এবং মোম হইতে বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু চীন দেশের অধিবাসীগণ উদ্ভিদ্ হইতে এক প্রকার মোম প্রাপ্ত হয়, তদ্দারা অতি উৎকৃষ্ট বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। চীনবাসীরা ঐ বৃক্ষকে মোমচীনা এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় উহাকে Tallow Tree বলা যায়। বঙ্গ ভাষায় এই মোমচীনাকে "মোমতরু" বলা যাইতে পারে।

চীনদেশে ও জাপানে ইহার চাষ আবাদ হইয়া থাকে। চীনের সাংহাই জেলাতে মোমচীনার উপর ২৫॥০ লক্ষ টাকার বিস্তৃত কারবার চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে দেরাদুন, কোহিস্থান, পঞ্জাব, বিশেষতঃ কোয়ালঘর, আকরতলী, কুমায়ুন এবং কাঙ্গারা উপত্যকা প্রভৃতি স্থানে অনেক দিন হইতে ইহার আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। যে কেহ আবাদ করিতে ইচ্ছুক হইলে, এই সকল স্থানে, বিনামূল্যে, এই মোমতরুর বীজ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

মোমতরুর আকার অতিশয় বৃহৎ। ইহার পত্রগুলি শিশুপত্রের মত। বৃক্ষগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা রাস্তা বা বাগান সুসজ্জিত করিবার জন্য রোপণ করা যাইতে পারে। এক একটি বৃক্ষ প্রচুর ফল প্রসব করিয়া থাকে। ফলের ব্যাসার্দ্ধ প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি। শীতের প্রারম্ভে ফল একত্র করিয়া উহার খোসা ছাড়াইতে হয়। বীচিগুলি এইরূপে পরিষ্কৃত হইলে শেষে বড় হামামদিস্তায় ফেলিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে পিষিয়া ফেলিতে বা থেঁতো করিতে হয়। বীচিগুলি অর্দ্ধপেষিত হইলে বৃহৎ লৌহ কটাহে আবশ্যক মত জলের সহিত জাল দিবে। বীচিগুলি যতই সিদ্ধ হইতে থাকে, ততই কড়াতে এক প্রকার ঘন পদার্থ ভাসিয়া উঠে। ইহা পাত্রের মধ্যে একবারে জমে না। সেই কারণে মোমটুকু একত্র করিয়া চালনীর মত কোন এক প্রকার পাত্রে ফেলিয়া বার কয়েক উত্তাপ সংযোগে গলাইয়া বিশুদ্ধ করিতে হয়। বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহার কোন প্রকার স্বাদ বা গন্ধ নাই। বিশুদ্ধ মোমচীনা দেখিতে সাদা এবং বেশ সক্ত হয়।

"যারে রাখ সেই রাখে"—চীনবাসীরা ইহার মর্ম্ম বেশ বুঝে। কোনও জিনিস অব্যবহার্য্য মনে করিয়া তাহারা ফেলিয়া দেয় না, বরং তাহা কাজে লাগাইবার চেষ্টা করে। ফলের শাঁস হইতে মোম প্রস্তুত করিবার পর, তাহারা বীচিগুলি ফেলিয়া দেয় না। কিন্তু বীচি হইতে পুনর্ব্বার এক রকম তৈল বাহির করে, তাহা ছাড়া উহা বার্নিস ও চুলের কলপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ তৈল ঔষধেও লাগে।

মোমতরু দেখিতে কতকাংশে দেবদারুর মত। কাষ্ঠ তত সক্ত বা তত কোমল নহে। চীন দেশে ছাপা কার্য্যে যত ব্লক বা কাষ্ঠফলক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা প্রায় এই কাষ্ঠেই প্রস্তুত হয়। মোমতরুর পত্র হইতে একপ্রকার রং প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পিষ্টক বৃক্ষ।

জগৎপাতা জগদীশ্বর মানবের জঠরানল নির্ব্বাণ করিবার জন্য কত প্রকার খাদ্য তাঁহার জগদ্ভাণ্ডারে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তণ্ডুল গম প্রভৃতি যেমন আমাদের প্রধান খাদ্য দ্রব্য সেইরূপ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণের প্রধান আহার্য্য পিষ্টক ফল (Bread fruit)। আমরা আটা, গম প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া আহার করি, তাহারা একবারে তাহা বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পিষ্টক বৃক্ষকে Artocurpus incises শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহার বৃহৎ সুচিক্কণ পত্র সকল দেখিতে অতিসুন্দর। এই বৃক্ষ ৪০ হস্ত পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে এবং ইহার গুঁড়ি অধিক মোটা হয় না। বৃক্ষের অর্দ্ধাংশ শাখাপ্রশাখাহীন। ইহার ফুল হয়। মৃত্তিকার গুণের তারতম্যানুসারে এই বৃক্ষের আকৃতি ও পত্রপুষ্পেরও তারতম্য হইয়া থাকে। ইহার ফল তরমুজের ন্যায়। ওজনে আড়াই সেরের অধিক হইবে। অর্দ্ধপক্ক অবস্থায় ইহার শাঁস নারিকেলের ন্যায় সাদা এবং দেখিতে রুটীর মত।

দ্বীপনিবাসীরা যেরূপ প্রণালীতে এই পিষ্টক ফল হইতে খাদ্য প্রস্তুত করে, তাহা অতি অদ্ভুত। তাহারা ফলকে প্রথমত অস্ত্র দ্বারা চারিখণ্ড করিয়া লয়। তৎপরে ভূমিতে একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে। এক একটি পিষ্টক পত্রে জড়াইয়া সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর রাখিয়া দেয়, ইহার উপর আবার উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড লাগাইয়া রাখে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গর্ত্তটি পূর্ণ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে থাকে। তৎপরে দুইখানি পিষ্টকপত্র এবং তদুপরি মৃত্তিকা দিয়া গর্ত্তটি ভরাট করিয়া দেয়। কিয়ৎকাল এইরূপ অবস্থায় রাখিলে উত্তপ্ত প্রস্তর খণ্ডের উত্তাপে পিষ্টক প্রস্তুত হয়।

পিষ্টকগুলি এইরূপে প্রস্তুত হইলে, উহার বহির্ভাগ পাটলবর্ণ এবং অন্তর্ভাগ ঠিক পাঁউরুটির মত দেখায়। ইহার আস্বাদ গমের রুটির মত। কিন্তু ইহা তদপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর।

পিষ্টক বৃক্ষ দ্বারা ঐ সকল দ্বীপবাসীগণের যে কেবল অন্নসংস্থান হয় এমন নয়। উহার বল্কল হইতে একপ্রকার সূত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা উহারা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরিধান করে। বৃহৎ বৃহৎ গুঁড়ীতে সালতী প্রস্তুত করে। যে সকল গুঁড়ি অপেক্ষাকৃত সরু তাহা খুঁটী করিয়া গৃহনির্ম্মাণ করে। গুঁড়ীতে অস্ত্রাঘাত করিলে দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ নির্য্যাস বহির্গত হয়,

তাহাতে একপ্রকার শিরিষ প্রস্তুত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই পিষ্টক বৃক্ষই উক্ত বর্ব্বরদ্বীপবাসিগণের জীবিকার প্রধান অবলম্বন।

কোন কোন স্থলে এই পিষ্টক ফল দ্বারা উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার বিচিগুলি কাঁচা খাইতে ভাল লাগে। পিষ্টক ফল সিদ্ধ করিলে আলু বা দুগ্ধের মত সুস্বাদু হয়। পর্য্যটক ওয়ালেস সাহেব বলেন, "আমি সমমণ্ডল ও গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদায় তরকারীর স্বাদ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু এমন উপাদেয় তরকারী আমি কোথাও দেখি নাই। পিষ্টক ফল মাংসের সহিত রন্ধন করিয়া খাইলে, ইহার আস্বাদন কখনও ভুলিতে পারা যায় না। দুগ্ধ, চিনি ও মাংসের সহিত পিষ্টক ফল মিশ্রিত করিলে অতীব হৃদ্য পরমান্ন প্রস্তুত হয়। উহার মধুর আস্বাদনে রসনা পরিতৃপ্ত হয়।"

দ্বীপবাসীরা সুপক্ব পিষ্টক ফলগুলিকে একত্রিত করিয়া রাখে। কিছুকাল এই-রূপ অবস্থায় রাখিলে ফলগুলি রসিয়া যায়। তখন তাহা হইতে একপ্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। কিন্তু আবার উত্তপ্ত প্রস্তরের সেঁক দিলে তাহা হইতে একপ্রকার সুগন্ধ বাহির হয়। এবং উহা হইতে যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা অতিশয় পুষ্টিকর।

দ্বীপনিবাসীরা কখনও কখনও পিষ্টক ফলগুলিকে চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লয়। তৎপরে ঐসকল গুঁড়া করিয়া উহা হইতে ময়দার মত একপ্রকার আটা প্রস্তুত করে। এই আটাতে রুটি, বিস্কুট, পরমান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। অনেকে শুষ্ক ফল হইতে আটা প্রস্তুত না করিয়া তাহা বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন করে।

প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইল, লেপ্টনেণ্ট ব্লাই পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই পিষ্টক বৃক্ষ আনিয়া রোপণ করেন। তদবধি এই সকল দ্বীপে পিষ্টক ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রথমে ১৬৮৮ খৃঃঅব্দে কাপ্তেন ডাম্পিয়ারের মুখে এই উপাদেয় ফলের সংবাদ অবগত হয়। তৎপরে কাপ্তেন কুক পৃথিবী প্রদক্ষিণ কালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এই পিষ্টক ফল দর্শন করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ বিষয়ক পুস্তকে এই ফলের বিষয় সবিস্তার বর্ণন করিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ ব্যূহে ইহার চাষ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য উপদেশ দেন। লেপ্টেনেণ্ট ব্লাই ১৭৮৭ খৃঃঅব্দে টাহিটী দ্বীপ হইতে বহুকষ্টে এই পিষ্টক বৃক্ষের চারা লইয়া যান। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এই মহোপকারী বৃক্ষ রোপণের অদ্যাপি কোন প্রকার উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না।

অশোকের অনুশাসন।

১ম অনুশাসন।

দেবতার প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার আদেশ মতে এই অনুশাসন খোদিত হইয়াছে। এখানে কেহ কোনও প্রাণী বধ করিবে না, ভক্ষণার্থেও করিবে না। রাজ প্রিয়দর্শী এরূপ ভোজন পাপজনক বিবেচনা করেন। পূর্ব্বে প্রিয়দর্শী স্বয়ংই মাংসাশী ছিলেন। রন্ধনাগারে নিত্য তাঁহার আহারার্থে সহস্র সহস্র প্রাণী বিনষ্ট হইত। যে সময় এই অনুশাসন খোদিত হয়, তখনও দুইটি ময়ূর ও একটি হরিণ এই তিনটি প্রাণী হত্যা করা হইত। কিন্তু ভবিষ্যতে ইহা এককালে রহিত হইয়া যায়।

২য় অনুশাসন।

দেবতার প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী স্বরাজ্যের সর্ব্বত্র ও চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, তম্বপাণি, গ্রীকরাজ এন্তিওকস ও তৎ প্রতিবাসী ভূপতিগণের রাজ্য লইয়া প্রান্তরাজ্যের সর্ব্বত্র মানব ও ইতরপ্রাণীর নিমিত্ত ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেস্থানে ফল মূলাদির নিমিত্ত বৃক্ষ লতার অভাব তাহা অন্য স্থান হইতে আনাইয়াও রোপণ করাইয়াছেন। সাধারণ পথের পার্শ্বে মনুষ্য ও প্রাণীর জন্য কূপ সকল খনন করাইয়াছেন।

৩য় অনুশাসন।

দেবতার প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন যে, আমার রাজত্বের দ্বাদশ বৎসর কালে আমি এইরূপ আদেশ ঘোষণা করিলাম যে, আমার রাজ্যে সর্ব্বত্র, বিশ্বাসিগণ রাজকগণ, স্থানীয় শাসনকর্ত্তৃগণ, পাঁচবৎসর অন্তর নিম্নোক্ত এই সমস্ত ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিবার জন্য এক সভা স্থাপন করিয়া ঘোষণা করিবেন যে পিতা মাতা জ্ঞাতিকুটুম্ব বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিগণের প্রতি স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করা ন্যায্য ও সাধুর কার্য্য। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে ভিক্ষা দান ন্যায্য ও সাধু কর্ম্ম। প্রাণিগণের প্রাণরক্ষা করা, রুক্ষ ভাষা প্রয়োগ ও অমিত ব্যয়িতা পরিবর্জ্জন করা ন্যায্য ও সাধু কর্ম্ম। ধর্ম্মোপদেশকগণ এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিবেন যে সেই উপদেশাবলীতে লোকের বিশেষ উপকার দর্শে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৫৭।০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩২৪৭। ৮
সমষ্টি	৩৪০৪॥ ৮
ব্যয় ...	২২৩ ৶৯
স্থিত	৩১৮১।১১

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৫০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	৪০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০৲
	৫০৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সুর কলিকাতা	৩৲
৺ „ জয়গোপাল সেন ঐ	১৲
শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী পুঁটিয়া	৩৷৴০
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত কীর্ত্তিপাশা	৩৷৴০
„ „ রঘুনাথ নাথ গোয়াড়ি	৩৷৴০
ভিন্ন ভিন্ন শকের কএক সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয়	৮৸৴০
	২৩৲
পুস্তকালয়	৪৶০
যন্ত্রালয়	৭৮/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	২৲
সমষ্টি	১৫৭।০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৬৮/ ৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৫॥০
পুস্তকালয় ...	২২৮৶৯
যন্ত্রালয় ..	১০৬॥৵৬
সমষ্টি	২২৩৶৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
প্রথম ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৬।

৬২৬ সংখ্যা। ১৮১৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापिसर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

জীবাত্মা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যখন মনে হয় যে আমি অমর, ঈশ্বর-প্রসাদে তাঁহার সহিত যুক্ত থাকিয়া নিত্য-কাল বিরাজ করিব, লোকলোকান্তরে বিচরণ করিব, যত কিছু বাহিরে দেখিব সকলকেই অনিত্য জানিয়া অন্তরের অন্তরাত্মা ঈশ্বরের সহবাসে তাঁহাতেই প্রেম সংস্থাপন করিব—তখন আমার আনন্দ কি হৃদয়ে ধরে? তখন কি আমি ইহ সংসারের ক্ষণভঙ্গুর পদার্থের প্রতি প্রীতি নিবেশ করি? কখনই না। পরন্তু তখন আমা হইতেও অধিক নিত্য পূর্ণ পুরুষে প্রীতি আরও দৃঢ় সংযুক্ত করি। আমি নিজে অবিনাশী, সংসারের বিষয় সকল বিনাশী। এই জন্যই সাংসারিক বিষয়ে প্রেম, আশা, ভরসা আমাদিগকে তৃপ্ত রাখিতে পারে না। প্রবৃত্তি সকল সাংসারিক বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইলেই অমনি ক্ষোভ উদ্গীরণ করে। এই জন্যই আমরা চাই যে বিষয় সকল আমাদের ন্যায় অবিনাশী হইয়া চিরকাল বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের প্রেম ও আশা ও আনন্দ চরিতার্থ করুক। কিন্তু আমাদের প্রার্থনাতে কি অনিত্য বিষয় সকল নিত্য হইয়া, জড় সকল চির-বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের প্রেম ও আনন্দ নিত্য চরিতার্থ করিবে? কখনই না। নিয়ন্তা ঈশ্বর! তিনি যাহাকে যতটুকু পরিমাণ স্থায়ী করিয়াছেন সে ততটুকু পরিমাণ স্থায়ী থাকিবে। তোমার ও আমার, কথায় থাকিবে না। অতএব আমরা অবিনাশী স্বরূপ জানিয়াও যেন অনিত্য বিষয়ে প্রেম সংস্থাপন করিয়া আঘাত প্রাপ্ত না হই। অনিত্য বিষয়ে প্রেম সংস্থাপন করিলে আমরা দুঃখ পাইব। নিত্য স্বরূপ ঈশ্বরে প্রেম সংস্থাপন করিলে আমাদের প্রেম ক্রমশই বর্দ্ধিত হইবে। দুঃখের আঘাত লাগিয়া নিরুদ্যম হইবে না।

এক্ষণে দেখা যাউক যে আমি স্বাধীন। নিজ সত্তার জন্য অপর কোন দ্রব্যের উপর আমি নির্ভর করি না। জড় বস্তুকে দেখ সে অনেকের উপর নিজ সত্তার জন্য নির্ভর করে। নিম্নে বনিয়াদ আছে—ইষ্টক সকল ধারণ করিয়া আছে, বনিয়াদের নীচে

পৃথিবী আছে, পৃথিবীর নীচে আকাশ আছে, এতগুলি আছে বলিয়া এই গৃহটী রহিয়াছে। এগুলি চলিয়া যাউক—গৃহটী তাহা হইলে থাকিবেক না। কিন্তু আমার থাকা অন্য কোন পদার্থের উপর নির্ভর করিতেছে না। আজ অন্ধকার আছে বলিয়া যে আমি আছি, সূর্য্য আছে বলিয়া যে আমি আছি—ইত্যাকার বাহ্য পদার্থ আছে বলিয়া যে আমি আছি তাহা নয়। সূর্য্য চন্দ্র চলিয়া যাউক, অন্ধকার চলিয়া যাউক—সমস্তই চলিয়া যাউক তথাপি আমি থাকিব। কারণ আমি জ্ঞানস্বরূপ। যদিও আমার জড়দেহ অন্নাভাবে আলোকাভাবে এবং অন্যান্য জড় অভাবে থাকে না কিন্তু আমি থাকিব। আমি আছি এই জ্ঞান দেহের উপর নির্ভর করিতেছে না। আমি দেহকে জানিতেছি বলিয়া যে আমাকে জানিতেছি এরূপ নয়। স্বপ্নাবস্থায় যখন দেহজ্ঞান থাকে না, ইন্দ্রিয়জ্ঞান থাকে না, তখন আমি স্বরূপে বিষয় জানিতেছি। সুষুপ্তি অবস্থায় দেহ আছে কি নাই তাহা জানি না, জগৎ আছে কি নাই তাহা জানি না, মন বুদ্ধি আছে কি না আছে তাহা জানি না—তথাচ জানি যে আমি আছি। এই আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আমি আছি এই জ্ঞান কাহারও উপর নির্ভর করে না। ইহা সহজ জ্ঞান। আমি আপনাকে নিত্যই জানিতেছি—যে কোন বস্তু জানিতেছি তাহার সঙ্গে আমি আছি ইহা জানিতেছি—অপরে আমাকে জানিতেছে না, একমাত্র অন্তর্যামী বই আর কেহ আমাকে জানিতেছে না। পরমাত্মা ব্যতীত আর কেহই আমাকে জানে না ও জানিতে পারেও না—পরমাত্মাই আমার একমাত্র বন্ধু। আমি আছি অনন্ত চৈতন্যের ক্রোড়ে—বিষয়-বিচ্ছিন্ন হইয়া যে আমি আছি এই জ্ঞানের ধ্বংস কিছুতেই করিতে পারে না। আত্মজ্ঞানের বিরোধী পদার্থ জগতে কিছুই নাই।

> "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি
> নৈনং দহতি পাবকঃ
> নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো
> ন শোষয়তি মারুতঃ।"

জড় আমার জড় শরীরকে ভিজাইতে পরে কিন্তু আমার জ্ঞান বা আমাকে ভিজাইতে পারে না। জলমগ্ন হইলেও আমি আছি ইহা আমি জানি। অগ্নি আমার দেহকে পুড়াইতে পারে কিন্তু আত্ম-জ্ঞান বা আমাকে পুড়াইতে পারে না। প্রবল ভীষণ বাত্যাঘাতে যদিও জড় দেহ কম্পান্বিত তথাপি তাহা আমিত্ব-জ্ঞানকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। আমি আছি এই আত্মজ্যোতিকে বায়ু নির্ব্বাপিত করিতে পারে না। এইরূপে বিচার করুন, দেখিবেন যে এই আত্মজ্ঞানকে কেহই লোপ করিতে পারে না, ইহা জ্ঞানমূল ঈশ্বর হইতে আগমন করিতেছে। জগতের কোন বস্তুই এই আত্মজ্ঞানের নির্ভরের স্থল নহে, পরন্তু পরমাত্মা।

উপরে দেখান গেল যে আত্মা জ্ঞানবিষয়ে স্বাধীন। এক্ষণে দেখা যাউক যে কর্ম্ম বা কর্ম্মমূল ইচ্ছা এবং ভাব বিষয়ে আত্মা স্বাধীন। পণ্ডিতেরা বলেন এবং মনোমধ্যেও বিচার করিয়া দেখুন যে আমি জ্ঞানময় মঙ্গলস্বরূপ অমর ও এক এবং দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি সকলি আমার শক্তি বিশেষ। দেহ মনের বশবর্ত্তী, মন বুদ্ধির বশবর্ত্তী, বুদ্ধি জীবাত্মার বশবর্ত্তী ও জীবাত্মা পরমাত্মার বশবর্ত্তী। ইচ্ছা ও ভাব দেহ মন ও বুদ্ধিকে চালিত করে। জ্ঞান বিষয়ে আমি যেমন স্বাধীন দেখান গেল—ইচ্ছা ও ভাব যাহা আমার

দেহ ও মন ইত্যাদি অপরাপর শক্তি সকলকে চালিত করে—আমি সেই ইচ্ছার অধীন, না ইচ্ছা ও ভাব আমার অধীন এইটী দেখান যাইবে। আমি কোন বিষয়ে ইচ্ছা করিতেও পারি নাও করিতে পারি এইরূপ যে আমাদের স্বাধীনতা আছে ইহা সকলেই জানেন। পণ্ডিতগণ ইচ্ছার স্বাধীনত্ব লইয়া বিস্তর বাক্‌বিতণ্ডা করিয়াছেন। সে সব বাক্‌বিতণ্ডার কথা আমি এক্ষণে আপনাদের নিকট বলিতে চাহি না। কেবল এইমাত্র বলিতে চাহি, যে নির্জ্জনে আপনার অন্তরের দিকে তাকাইয়া দেখিবেন যে কৃত কর্ম্মটী করিতে আমরা বাধ্য ছিলাম, না স্বেচ্ছামত কৃত কর্ম্মটী করিয়াছি। তাহা হইলে আপনাদের অন্তর অবশ্যই উত্তর দিবে যে কৃত কর্ম্মটী আমি স্বেচ্ছাতঃ করিয়াছি। উহা না করিলেও করিতে পারিতাম; আমার আত্মাতে এমন স্বাধীনতা রহিয়াছে। ভাল মন্দ দুই প্রকারের ইচ্ছা সকলই আমাদের মনে আছে কিন্তু তাহাদিগের পরিচালন আমার উপর নির্ভর করে। আমি কু-ইচ্ছা সকলকে দমন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সু-ইচ্ছা সকলকে কার্য্যে যথাযথ নিয়োজিত করিতে পারি। ভাব বিষয়েও দেখুন আমরা স্বাধীন। আমি ভাবিলাম না—চিন্তা করিলাম না পরন্তু অপর একটী বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে যে হঠাৎ একটী ভাব উদয় হইয়া আমাকে দুঃখস্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গেল এমন হয় বটে। কিন্তু ইহা বলিয়া যে ভাবের উপর সুখ দুঃখাদির উপর আমি কর্ত্তৃত্ব করিতে পারি না এমন নয়। যেমন স্বপ্নাবস্থায়- বাহ্য জগৎকে বা দেহ-জ্ঞানকে আমরা মনোমধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে পারি তদ্রূপ এক বুদ্ধিতে আমরা সমস্ত মনকে ডুবাইতে পারি। মনে কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, আশা ভয় ইত্যাদি যতগুলিন আছে—যাহাদিগকে প্রবৃত্তি বা বৃত্তি বলে সে সকলকে আমরা মনোমধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারি। যখন চিত্ত কোন এক বিষয়ে একাগ্র হয়, তখন অপর কোন ভাব মনে উদয় হয় না। ছাত্র যখন পাঠে একাগ্রচিত্ত হয় তখন তাহার সেই আলোচ্য বিষয় বই মানসে আর কিছুই উদয় হয় না—কাম, ক্রোধ, লোভ মোহাদির কথা দূরে থাকুক, ক্ষুধা যে জড় প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম তাহারও উদ্রেক বোধ হয় না। যোগীগণ যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ, আশা ভয় ইত্যাদির অতীত হইয়া যোগসাধন করে, তাহারও অর্থ এই যে ইচ্ছা এবং ভাব বিষয়ে আমরা স্বাধীন। চিত্ত একাগ্র হইলে সেই ধ্যেয় বস্তু ভিন্ন মনে আর কিছুই উদয় হয় না। মনের বৃত্তি সকল, দেহের অঙ্গ সকল, বুদ্ধি স্মরণশক্তি আদি যাহা কিছু আমাদের আছে—যাহা কিছু আমার, সে সমুদায়ই আমার শক্তি—সে সমুদায়ের উপর আমি স্বাধীন ও কর্ত্তা কিন্তু সে সমুদায়ের অধীন আমি নহি। জড় জগৎ সম্বন্ধে আমরা যেমন স্বাধীন নিজের শক্তিগুলির উপরও তদ্রূপ। এই স্বাধীনতার ভাব আমরা জানিয়া যেন কার্য্যেতে আমরা অন্ধ প্রবৃত্তি কর্ত্তৃক নিয়োজিত হই না। জড় রাজ্যের, অজ্ঞান জীব জন্তুদিগের দেখ, তাহারা অপরের উদ্দেশ্য সাধনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অশ্বাদি পশুর যে বল, তাহা মনুষ্যের সুখোদ্দেশ্যসাধনে নিয়মিত হয়, কিন্তু আমাদের যে বল বা শারীরিক ও মানসিক শক্তি তাহা নিজের উদ্দেশ্য সাধনে আছে—অপরের জন্য নহে। বৃক্ষ যে ফল ধারণ করে, তাহা নিজের উদ্দেশ্য

সাধনে নয়, বৃক্ষ নিজে ঐ ফলের ভোক্তা নয়। পুষ্পবৃক্ষ যে পুষ্পরাজি প্রসব করে, সে তাহার নিজের উদ্দেশ্যে নয়, নিজের ঘ্রাণশক্তি বা ভোগ চরিতার্থ করিবার জন্য নয়—পরন্তু জ্ঞানস্বরূপের ভোগ চরিতার্থ করিবার জন্য। পৃথিবী যে লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদি নিজ গর্ভে ধারণ করিয়াছে তাহা নিজের জন্য নয়, পরন্তু জ্ঞানের ভোগের জন্য। এইরূপে মনে বিচার কর দেখিবে যে জড় যেমন জ্ঞানের ভোগ চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে, জ্ঞান তেমন জড়ের ভোগসাধন করিবার জন্য নয়। জ্ঞানই জগতে ভোক্তা আর কেহই হইতে পারে না। মনুষ্য যে মনুষ্যের অধীন হয় সেও নিজ ভোগ চরিতার্থ করিবার জন্য, কিন্তু জড় সেবা করা মনুষ্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আমরা তবে কিসের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি? ঈশ্বরের জ্ঞান-ধর্ম্ম, মঙ্গলভাব, আনন্দভাব হৃদয়ে উপভোগ করিবার জন্য ইহ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। পরমাত্মা লক্ষ্য, জীবাত্মা সাধক ও জড় প্রকৃতি বাধক। জড় প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করিয়া যত তুমি সেই ভূমার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই তোমার সিদ্ধির পথ পরিষ্কার হইতে থাকিবে। আত্মজ্ঞানে জানিলাম যে আমি জ্ঞানস্বরূপ—আমি আমাকে জানি ও পরমাত্মা আমাকে জানেন—পর আমাকে জানে না এই জন্য পরমাত্মাই আমার বন্ধু। আত্মজ্ঞানে জানিলাম যে আমি এক, বিষয় বহুল—অনেক। একের সহিত অনেকের বন্ধুতা হয় না—বিষয়ের সহিত এই জন্য আত্মার মিল হয় না। অতএব বিষয় বিভবে আত্মাকে যুক্ত না করিয়া সেই এক জ্ঞানময় ঈশ্বরে আত্মাকে যুক্ত করিব। আত্মজ্ঞানে জানিলাম যে আমি মঙ্গলস্বরূপের আদেশে কথঞ্চিৎ মঙ্গলস্বরূপ অতএব আমাদের সমুদায় শক্তিকে নিজের ও অপরের মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত করিব। এইরূপে আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ অমর ও এক জানিয়া আপনাদিগকে অজর অমরের পুত্র জানিয়া যেন ক্ষুদ্রমনা হইয়া সংসারে আপনাকে লইয়া আমরা ব্যতিব্যস্ত না হই। যেন ঈশ্বরকে একমাত্র বন্ধু জানিয়া পিতা মাতা ও সখা জানিয়া বিষয়ের শরণাপন্ন না হইয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হই। আপনার স্বরূপ জানিয়া সকল কর্ম্মে তাহা স্মরণ রাখিয়া রোগে—শোকে—পাপে—তাপে যেন দগ্ধ না হই। আত্মন! জাগ্রত হও! বিষয়স্বপ্নে আর নিদ্রিত থাকিও না—নিজেরও নিজ পিতার স্বরূপ দেখ ও আনন্দিত হও। হে ঈশ্বর, পাপ তাপ জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে আত্মাতে তোমাকে লাভ করি, সেই আশীর্ব্বাদ প্রেরণ কর—বিষয়চিন্তাকে দূর করিয়া মধ্যে মধ্যে আমি যেন আত্মচিন্তা ও আত্মাকে তোমাতে যুক্ত করিতে পারি। তুমি মঙ্গলময়, তুমি আমাকে জানিতেছ—আমার মঙ্গল জানিতেছ—তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব—

ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

আমরা গত আষাঢ় মাসের পত্রিকায় সন্ধ্যাকালের গায়ত্রীধ্যানে বৃষভবাহিনী এই বিশেষণের সার্থকতা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি, এবং যে ভাবে তাহা বিবৃত করিয়াছি, তাহা পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে

পারে। সমগ্র ঋগ্বেদ সংহিতা আলোচনায় বৃষভবাহিনী এই শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা যে একটু স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি; পাঠকগণ যেটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাই তাঁহারা গ্রহণ করুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

আজকাল পল্লীগ্রামে বৃষের অত্যাচার গল্পের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিউনীসিপালিটীর শকট বহন করিবার জন্য শ্রাদ্ধে উৎসৃষ্ট বৃষগুলি ধৃত হয় বলিয়া, তাহাদিগকে আর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরাও নিতান্ত শৈশবাবস্থায় দেখিয়াছি, বাগানের চারা গাছগুলিকে বৃষগণ পদদলিত করিতেছে, অগ্রভাগ ছিঁড়িয়া খাইতেছে, কাহারও সাহস হইতেছে না যে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাড়াইয়া দেয়। বারাণসী প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে উদ্দাম বৃষের শৃঙ্গাঘাতে মনুষ্যের মৃত্যু আমরা সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়া থাকি। বৈদিক কবিগণ বৃষের ভীষণ পরাক্রম সন্দর্শনে উহাকে কৃতান্তের সহচর না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। মহিষে বরং কতকটা শান্তভাব আছে, কিন্তু পরিণতবপু বৃষের আকৃতি দেখিলেই ভয়ের সঞ্চার হয়। এই জন্য যে কারণে যমের বাহন মহিষ, সেই কারণে সংহারমূর্ত্তি মহাদেবের বাহন বৃষ। ঋক্‌বেদের ৫ অষ্টকের অষ্টম মণ্ডলের ১ম সূক্তের ২য় ঋকে আছে, "বৃষভের ন্যায় শত্রুদিগের হিংসাকারী ও জরারহিত ও বৃষভের ন্যায় মনুষ্যদিগের পরাভবকারী ... ... দাতৃতম ইন্দ্রকে স্তব করি।" বৃষভ শব্দ দুর্দ্ধর্ষ বলের পরিচায়ক, এই জন্য ৬ষ্ঠ অষ্টকে ৮ম মণ্ডলের ৪৫ সূক্তের ২০ ঋকে আছে, "হে বলপতি (ইন্দ্র)! আমরা ক্ষীণ হইয়া দণ্ডের ন্যায় তোমাকে লাভ করিব। ২১ ঋকে আছে ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর, যুদ্ধে তাঁহাকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না। ২২ ঋকে আছে হে বৃষভ (অর্থাৎ বলবান) ইন্দ্র" ইত্যাদি। ৭ অষ্টকের ৯ম মণ্ডলের ৭০ সূক্তের ৭ম ঋকে আছে, "সোম যেন একটি ভয়ঙ্কর বৃষভ, তাহাকে যখন কলসের মধ্যে ঢালা হয়, তখন তাহার যে দুই ধারা বিগলিত হইতে থাকে, তাহাই যেন তাহার দুই শৃঙ্গ, সতর্ক সাবধান সোম আপনার বল বৃদ্ধি করিবার জন্য, সেই দুই শৃঙ্গ শানিত করিতে করিতে শব্দ করিতেছেন"। ৮ম অষ্টকের ১০ ম মণ্ডলের ১০২ সূক্তের ৪র্থ ঋকে আছে, "দেখ এই বৃষ মহানন্দে জলপান করিল, মৃত্তিকাস্তূপ শৃঙ্গ দ্বারা খনন পূর্ব্বক শত্রুর দিকে ধাইতেছে। ৬ষ্ঠ ঋকে আছে শত্রুহিংসার জন্য বৃষ যোজিত হইল। পরবর্ত্তী ১০৩ সূক্তের ১ম ঋকে আছে ইন্দ্র সর্ব্বব্যাপী শত্রুদিগের পক্ষে তীক্ষ্ণ, বৃষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শত্রুবধকারী। মনুষ্যদিগকে বিচলিত করেন, মনুষ্যেরা ত্রস্ত হয়। পরবর্ত্তী ১১৬ সূক্তের ৪র্থ ঋকে আছে, হে ইন্দ্র! বৃষের ন্যায় বলপ্রকাশ পূর্ব্বক যজ্ঞের শত্রুগণকে বিনাশ কর"।

বেদের ভিতর হইতে অন্যান্য স্থান উদ্ধৃত না করিলেও প্রতীত হইবে যে কি কারণে পুরাণের ভিতরে বৃষকে মহাদেবের বাহন করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য বৃষের সে ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণা করিতে হইলে, সহরের গো-শকটের বৃষ দেখিলে কিছুই হইবে না। এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। যখন ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তি বিভক্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই

তিন দেবতায় পরিণত হয়, তখন মহাদেবে বিনাশকারিত্বই সংকল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে যখন সৌর গাণপত্য শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে সমগ্র হিন্দুসমাজ বিভক্ত হইল, তখন দলাক্রান্ত লোকগণ আপন আপন অভীষ্ট দেবতাকে পূর্ণ শক্তি প্রদান করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকে আর অঙ্গহীন রাখিলেন না। এই কারণেই বোধ হয় মহাদেবের বিনাশকারিত্বের উপর লক্ষ্য না রাখিয়া তাঁহাকে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়শক্তিতে মূর্ত্তিমান করিলেন। এবং আমরাও মহাদেবের ধ্যানে "বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং প্রসন্নং" প্রভৃতি বিশেষণের উল্লেখই পাইলাম।

কবিত্ব বুঝিবার অসামর্থ্য হিরণ্যপাণির প্রকৃত অর্থ মলিন করিয়া দিয়াছে। হিরণ্যপাণির প্রকৃত অর্থ সূর্য্য, সুবর্ণের ন্যায় তাহার কিরণ বলিয়া। পাণির অর্থ কিছু এখানে হস্ত নহে। কিন্তু পৌরাণিক সময়ে অর্থবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এমন কি বেদরচনার বহুকাল পরে আবির্ভূত সায়ণাচার্য্যও নিজে টীকায় বলিলেন "যজমানায় দাতুং হস্তে সুবর্ণধারিণং" অর্থাৎ যজমানকে দিবার জন্য সূর্য্যের হস্তে সুবর্ণ থাকে; যাহার উপরে সূর্য্য প্রসন্ন হয়েন তাহাকে স্বর্ণদান করেন। সূর্য্যের বাহু যে সুবর্ণগঠিত পুরাণের ভিতরে এরূপ উল্লেখের অসদ্ভাব নাই। পরন্তু ইহাও আছে যে সূর্য্য কোন যজ্ঞে অন্যায় করিয়া হব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এই হেতু তাঁহার হস্ত ছিন্ন হইয়া যায়, যাজ্ঞিকেরা তাঁহার সুবর্ণের বাহু নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। সূর্য্যের কিরণ সূর্য্যের পুরোবর্ত্তী হইয়া আকাশে ধাবিত হয়, এই জন্য বেদের ভিতরে সূর্য্যকে হরিতবর্ণ অশ্বযুক্ত বলিয়া অনেকস্থলে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে সূর্য্য ৭ টি অশ্ব জুড়িয়া আকাশে ধাবিত হন এইরূপ স্থূল বিশ্বাস জনসাধারণের মনকে অধিকার করিয়াছে। সূর্য্যের সহস্র কিরণ সহস্র দিকে প্রধাবিত হয় বলিয়া সূর্য্যের সহস্রাক্ষ নামের উল্লেখ বেদের ভিতরে আছে। কিন্তু সহস্রাক্ষ নাম বর্ত্তমানে সে অর্থ হারাইয়াছে।

বৃত্রাসুর যুদ্ধ যাহা আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, যদিও তাহার মূল বেদের ভিতরে, কিন্তু বেদে তাহার অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঋগ্বেদ সংহিতায় ১ম মণ্ডলের ১অষ্টক ৩২ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। বৃত্র মেঘের নামান্তর মাত্র। ইন্দ্র বৃত্র বা মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বারিবর্ষণ করেন। এই সূক্তের ১ম ২য় ঋকে আছে, ইন্দ্র মেঘকে (অহিকে) হনন করিয়াছিলেন; পরে বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া বহনশীল পার্ব্বতীয় নদী সমূহের পথ ভেদ করিয়া দিয়াছিলেন। ইন্দ্র পর্ব্বতাশ্রিত অহিকে (অর্থাৎ মেঘ পর্ব্বতের গাত্রে লাগিলে যে বারিবর্ষণ হয় তাহা বৈদিক কবিদের জানা ছিল) হনন করিয়াছিলেন ... ... যেরূপ গাভী সবেগে বৎসের দিকে যায়—ধারাবাহী জল সেইরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছিল। ৫২ সূক্তের ৫ ঋকে আছে, গমনশীল জল যেরূপ নিম্নদেশে যায়, ইন্দ্রের সহায়ভূত মরুতগণ সোমপানে হৃষ্ট হইয়া সেইরূপ যুদ্ধে লিপ্ত ইন্দ্রের সম্মুখে বৃষ্টিযুক্ত বৃত্রের অভিমুখে যাইল। ৬ষ্ঠ ঋকে আছে, যে বৃত্র অন্তরীক্ষে শয়ান ছিল এবং অন্তরীক্ষে যাহার ব্যাপ্তি অসীম, হে ইন্দ্র, যখন তুমি সেই বৃত্রের হনুদ্বয় শব্দায়মান বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়াছিলে, তখন তোমার শত্রুবিজয়িনী দীপ্তি বিস্তৃত হই-

য়াছিল। (বৃ ধাতুর অর্থ আবরণ করা, বৃত্র অর্থে যে আবরণ করে মেঘ)। ৮ম ঋকে আছে ইন্দ্র তুমি বৃত্রকে হত করিয়াছ, বারি বর্ষণ করিয়াছ ... .. (মেঘ অপসারিত করিয়া দিয়া) আমাদের দর্শনার্থ আকাশে সূর্য্য স্থাপন করিয়াছ। ৮ম অষ্টকের ১০ম মণ্ডলের ১১১ সূক্তের ৯ ঋকে আছে হে ইন্দ্র! বৃত্র যখন জল সমূহ গ্রাস করিয়াছিল, তুমি তাহা মোচন করিয়া দিলে; তখন জলরাশি সর্ব্বত্র বেগে ধাবিত হইল; ইন্দ্র ইচ্ছা পূর্ব্বক যখন জল মোচন করিয়া দিলেন, তখন সেই পরিশুদ্ধ জল সকল আর স্থির থাকিতে পারিল না। ১৪৭ সূক্তের ১ম ঋকে আছে,"হে ইন্দ্র তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছ, ও লোকহিতার্থে বৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছ, হে বজ্রধারী, এই পৃথিবী তোমার প্রভাবে কাঁপিতে থাকে। ২য় ঋকে আছে হে ইন্দ্র! তুমি অন্ন সৃষ্টি করিবার সংকল্প করিয়া আপনার ক্ষমতা দ্বারা মায়াবী বৃত্রকে পীড়া দিলে"। এই বৃত্রের বৃত্তান্ত লইয়া পুরাণের ভিতরে যে সকল আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সকলেই বিদিত আছেন।

ইন্দ্রাদি দেবগণকে পৌরাণিকগণ কেবল নিরবচ্ছিন্ন দেবত্ব দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তাঁহাদিগকে সংসারী করিয়াছেন। দেবতাগণকে পাপ স্পর্শ করে না তাঁহারা এই প্রমাণের দোহাই দিয়া তাঁহাদিগকে অনেক গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত ও কলঙ্কিত করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। কিন্তু ঋগ্বেদ পাঠে শচী দেবীকে ইন্দ্রের অস্থিমাংসময়ী প্রণয়িনী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। প্রকৃত পক্ষে শচী অর্থে যজ্ঞ, শচীপতি অর্থে যজ্ঞপতি। শুদ্ধ ইন্দ্র দেবতা কেন, অন্যান্য দেবগণও শচীপতি এই বিশেষণে অভিহিত। ৫ম অষ্টকের ৭ম মণ্ডলের ৬৭ সূক্তের ৫ম ঋকে আছে, হে অশ্বিদেবদ্বয়, তোমরা আমার ধনাভিলাষী সরল এবং হিংসারহিত বুদ্ধিকে লাভক্ষম কর, সংগ্রামেও আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে রক্ষা কর, হে শচীপতিদ্বয়! স্তোত্র প্রযুক্ত আমাদিগকে ধন দান কর"। এইরূপে পুরাণের ভিতরে যে বেদের কত অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাহা কে সংখ্যা করিবে।

পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে গৌতমের অনবস্থান কালে ইন্দ্রদেব গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করেন ও অহল্যার ধর্ম্মনষ্ট করেন। গৌতমের অভিশাপে অহল্যা পাষাণী হইলে বহুকাল পরে রামচন্দ্র আসিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। অহল্যা বাস্তবিক পাষাণী হইয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গৌতম অহল্যা ও ইন্দ্র বেদের ভিতরে ঋষিগণের নিকটে অন্যান্য অর্থে পরিচিত। ঋষিগণ প্রভাতের ছবি আঁকিতে বসিয়া ইহাদের আবাহন করিয়াছিলেন। রাত্রির অপগমে সূর্য্যের বিমল কিরণ ফুটিয়া উঠিল ইহাই তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় ছিল। অহল্যা শব্দের অর্থ (অহন+লী) দিনে যাহা লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ রাত্রি। গোতম ও গোমৎ একই শব্দ; বর্ণবিন্যাসের ত্রুটিতে এরূপ দাঁড়াইয়াছে। গোতম শব্দ যেমন গোমৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ শব্দবিপর্য্যয় দুষ্প্রাপ্য নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কশ্যপ শব্দ পশ্যক হইতে উৎপন্ন। পশ্যতি যঃ স পশ্যকঃ(বর্ত্তমান ব্যাকরণের নিয়মে দর্শক হওয়া উচিত) অর্থ, যে দেখে। গোতম গৌতম বা গোমৎ শব্দের অর্থ চন্দ্র (গো

শব্দের অর্থ চিহ্ন, গোমৎ চিহ্নবৎ সকলঙ্ক চন্দ্র; অথবা গো শব্দের অর্থ সূর্য্যরশ্মি, গোমৎ অর্থে সূর্য্যরশ্মিবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহার নিজের দীপ্তি নাই, সূর্য্যরশ্মি পাইয়া যে প্রভা লাভ করে। ইন্দ্র শব্দের অর্থ সূর্য্য, বেদের ভিতরে ইন্দ্র বহুল স্থানে এই অর্থে ব্যবহৃত। জিজ্ঞাসা হইতে পারে, অহল্যার বা রাত্রির পতি কে? নিশাপতি চন্দ্র। গৌতম অথবা চন্দ্র যখন পৌরাণিক বর্ণনানুযায়ী (গঙ্গা স্নানার্থ প্রভাতে গৃহ হইতে) নিক্রান্ত হইলেন, তখন কি ঘটিল? ইন্দ্র বা সূর্য্য অজ্ঞাতসারে স্নিগ্ধ অরুণ কিরণ লইয়া অহল্যার গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং অহল্যার ধর্ম্মনষ্ট করিলেন অর্থাৎ আপনার তেজ অহল্যার অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকারের উপরে নিক্ষেপ করিলেন, অন্য কথায় রাত্রি পোহাইয়া গেল, অন্ধকার বিদূরিত হইল, প্রভাত সূর্য্যকিরণে চারিদিক আলোকিত হইল। এখানে একটি কথা উঠিতে পারে ইন্দ্র বা সূর্য্যকে অহল্যা বা রাত্রির উপপতি বা জার বলিয়া বর্ণনা করিবার কি সার্থকতা ছিল। "অহল্যায়াঃ জারঃ সুরপতিঃ" এই কয়েকটি কথা বেদপাঠিগণের পরিচিত; অর্থ সুরপতি ইন্দ্র অহল্যার জার। কিন্তু এই জারশব্দের প্রকৃত অর্থ কি। জার শব্দের উৎপত্তি জৃধাতু হইতে, অর্থ জীর্ণ করা। অহল্যার জার ইন্দ্র, ইহার অর্থ যে, (সূর্য্য) রাত্রিকে জীর্ণ করিয়া ফেলে, অন্ধকার দূর করিয়া দেয়। এখানে জার শব্দের অর্থ জারয়িতা, জীর্ণ কারক, বিনাশক। কিন্তু জার শব্দের আর একটি চলিত অর্থ আছে, সেই অর্থে জার শব্দে উপপতি বুঝায়। পৌরাণিকগণ জার শব্দের এই শেষবিধ অর্থ ধরিয়া পুরাণের কাহিনী রচনা করিয়াছেন। এবং ইন্দ্র ও অহল্যাকে দেহধারী করিয়া সমুদয় ঘটনাকে অদেবোচিত ব্যাপারে পরিণত এবং ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া গৌতমের শাপে অহল্যাকে পাষাণে পরিণত করিয়াছেন।

উপরে অহল্যা ও গৌতম সংবাদ যেরূপে ব্যাখ্যাত হইল, তদ্বিষয়ে পাঠকবর্গের সন্দেহ উঠিতে পারে বলিয়া আমরা পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতীর ঋগ্বেদভাষ্য ভূমিকা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাত্রিরহল্যা কস্মাদহর্দিনং লীয়তেঽস্যাং তস্মাদ্রাত্রিরহল্যোচ্যতে। স চন্দ্রমাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রমোদয়তি স্বস্ত্রিয়াঽহল্যয়া সুখয়তি। অত্র স সূর্য্য ইন্দ্রো রাত্রেরহল্যায়া গৌতমস্য চন্দ্রস্য স্ত্রিয়ো জার উচ্যতে। কুতঃ, অয়ং রাত্রে র্জারয়িতা। ··· ··· ···। রাত্রেরায়ুষো বিনাশক ইন্দ্র সূর্য্য এবেতি মন্তব্যং। এবং সদ্বিদ্যোপদেশার্থলঙ্কারায়াং ভূষণরূপায়াং সচ্ছাস্ত্রেষু প্রণীতায়াং কথায়াং সত্যাং যা নবীনগ্রন্থেষু পূর্ব্বোক্তমিথ্যা কথা লিখিতাস্তি সা কেনচিৎকদাপি নৈব মন্তব্যা হেতাদৃশোঽন্যাশ্চাপি।

অর্থ। "রাত্রি দিনে লয় পায় বলিয়া তাহার নাম অহল্যা, চন্দ্রমা সকল ভূতকে আনন্দিত করে এবং আপনার স্ত্রী অহল্যার সহিত সুখসম্ভোগ করে। এই কারণে সূর্য্য বা ইন্দ্র, গৌতম বা চন্দ্রের স্ত্রী অহল্যার জার কহে। রাত্রির আয়ুকালকে বিনষ্ট করে সূর্য্য বা ইন্দ্র। সৎশাস্ত্রের রূপক অলঙ্কার বুঝিতে না পারিয়া নবীন গ্রন্থকারেরা যে সমস্ত মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন তাহা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।" দয়ানন্দ স্বরস্বতি স্বামীজির অপরিমেয় জ্ঞানের প্রতি যাঁহাদের তাদৃশ আস্থা নাই তাঁহাদিগের জন্য সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন মীমাংসাকার কুমারিল ভট্টের গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তং ইন্দ্রশব্দবাচ্যঃ সবিতা এব অহনি লীয়মানায়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ

ক্ষয়াত্মকজরণ হেতুত্বাৎ জীর্য্যতি অস্মাৎ .অনেন বেদি-তেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।”

তেজস্বী সূর্য্য পরমেশ্বরত্ব হেতু ইন্দ্র দেবতা বুঝায়। অহল্যারূপী রাত্রি দিবসে লীন হয় বলিয়া ও রাত্রিকে জীর্ণ করিয়া ফেলে বলিয়া সূর্য্যকে অহল্যা বা রাত্রির জার বলে, বাস্তবিক পরস্ত্রীব্যভিচার হেতু নহে।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাহইতে অহল্যা গৌতম ও ইন্দ্র সম্বন্ধে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না। যদি কেহ বলেন এই সকল কথা মূল রামায়ণের ন্যায় সুপ্রাচীন গ্রন্থের ভিতরে কেমন করিয়া আসিয়া পড়িল। আমরা তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে গৌতম নামক কোন এক ঋষির আ-শ্রমে গিয়া থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে গৌতম ও অহল্যা সম্বন্ধীয় কাহিনী লেখ-কের মনে পড়িয়া থাকিবে। তাই তিনি স্বকপোলকল্পনা বলে ঘটনাটি পৌরা-ণিক গল্পচ্ছলে বলিয়া চলিলেন। মূল রামায়ণের ভাষা ও ভাব যেরূপ প্রাঞ্জল ও অকৃত্রিম তাহাতে আমাদের মনে হয় যে রামচন্দ্রের আশ্রম ভ্রমণ অবলম্বনে কার্ত্তি-কেয়ের জন্ম গঙ্গার উৎপত্তি প্রভৃতি যে সমস্ত অসম্ভবপর ঘটনার উল্লেখ আছে তৎসমুদায় পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়া মূলগ্রন্থে নিপুণতার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আদিম আর্য্যদিগের পুরাবৃত্ত।

প্রথম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মনু স্বয়ম্ভু নামের উৎপত্তি বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সচরাচর যে সকল বিষ্ণুপুরাণ পাওয়া যায় তাহাতে আছে। কিন্তু বিখ্যাত Sanscrit Texts নামক গ্রন্থের প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মিউর সাহেবের নিকট যে বিষ্ণুপুরাণ ছিল তা-হাতে আছে

“ততো ব্রহ্মাত্মসম্ভূতং পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবম্ প্রভুম্
আত্মানং এব কৃতবান প্রজাপালং মনুং দ্বিজঃ।”

“ব্রহ্মা তৎপরে আত্মসম্ভূত প্রভু স্বয়ম্ভু মনু যিনি তিনি নিজে আপনি, তাঁহাকে প্রজাপালন পদে নিযুক্ত করিলেন।”

আমরা ইতি পূর্ব্বে “ব্রহ্মা প্রজাপাল-নার্থ আত্মসম্ভূত মনু হইলেন” বলিয়াছি, ঐ বাক্য ও ব্রহ্মা আত্মসম্ভূত মনুকে প্রজাপালক করিলেন এই বাক্য এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। আত্মসম্ভূত মনুর অর্থ মনু তাঁহার মানস পুত্র অর্থাৎ শিষ্য ছিলেন ও তিনি ও মনু একই যেহেতু মনু তাঁহার আত্মজ অর্থাৎ পুত্র। লোকে বলিয়া থাকে “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।” মনুষ্য নিজেই পুত্র হইয়া জন্মান, তাহা মানস পুত্র হউন অথবা ঔরসজাত পুত্র হউন। আমরা পূর্ব্বে লিখিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া মিউর সাহেবের পুস্তকের অর্থানুসারে চলিব। মনু স্বয়ম্ভু যখন ব্রহ্মার পরে রাজা হইবেন সেই স্থান আসিলে আমরা তাঁহার বিষয় বলিব, এক্ষণে কিছু বলিব না। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বের পংক্তিগুলি ইংরাজীতে লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে অনুবাদিত, আ-মরা ইংরাজীতে এই ইতিহাস লিখিবার সময় মিউর সাহেবের পুস্তকের কথা অব-গত ছিলাম না।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মা প্রজা-পতিপদ হইতে তাঁহার সংসারবিরক্ত কতকগুলি শিষ্যকে চ্যুত করিয়া অন্য কতকগুলি শিষ্যকে তৎপদে নিযুক্ত করি-লেন। যাহাদিগকে পদচ্যুত করিলেন

তাঁহাদিগের পক্ষে এক জন ফরাসীস জ্ঞানী (Consin) যাহা বলিয়াছেন তাহা বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন যে মানব জাতির শৈশবাবস্থায় যখন মনুষ্যের হৃদয়ে এক মহান্ ঈশ্বরের অস্তিত্বের এবং তাঁহার অনুপম মাধুরীর ভাব প্রথম প্রকাশিত হয় তখন বিষয়-মায়া-জালের প্রতি তাঁহার এক মহা বিতৃষ্ণা জন্মে এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে সংসারের সকল পাশ ছিন্ন করিয়া বিরলে বসিয়া তিনি ঈশ্বরধ্যানের অনির্ব্বচনীয় সুধাপানে রত হয়েন।

ব্রহ্মার প্রথম শিষ্যদিগের সংসারের প্রতি এইরূপ স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা তাঁহার আন্তরিক অভিলাষের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কারণ তিনি মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন যে এই শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা তিনি এক অভিনব সমাজ ও অভিনব ধর্ম্ম সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইবেন। এই বিষয়ে বিফলমনোরথ হইয়া ব্রহ্মা সেই শৈশব আর্য্য সমাজের নেতৃত্ব কিছু কালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য এই কার্য্যের পরিণাম অতীব ভীষণ হইয়াছিল। কোন অভিনব সমাজ গঠন সময়ে তাহা তাহার নেতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তাহাতে মহান অনিষ্টের উৎপত্তি হয়। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে একটি রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। রুদ্রের অর্থ এখানে সামাজিক গণ্ডগোল। ব্রহ্মার অন্তর্ধ্যানে সেই নূতন আর্য্য সমাজে মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। সামাজিক সকল প্রকার বন্ধনের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া তদানীন্তন আর্য্যগণ এক ভীষণ বিপ্লব ব্যাপার সংঘটন করে এবং সেই বিপ্লবে স্ত্রী ও পুরুষ সকলে যোগ দেয়। স্ত্রীগণ পুরুষাপেক্ষা স্বভাবতঃ চঞ্চলমতি ও ভাবুক প্রকৃতি বিশিষ্ট এই হেতু সেই বিপ্লবে তাহারা অধিকতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল।

যখন এই বিপ্লব সেই শৈশব আর্য্য সমাজে সংঘটিত হয় তখন সেই সমাজ অন্য সমাজের ন্যায় স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই দলে বিভক্ত ছিল। সেই হেতু পুরাণ সেই সমাজকে অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ ও অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রী এমন এক রাক্ষস কল্পনা করিয়াছে। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মা সেই রাক্ষসকে অর্থাৎ সেই সমাজস্থ স্ত্রী ও পুরুষগণকে আপনার সম্মুখে আহ্বান করিয়া দ্বিধা হইতে অর্থাৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইতে উপদেশ দেন। সেই সময় হইতে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হয়। এই সময় হইতেই স্ত্রীলোকদের বিরলে থাকিবার প্রথার অর্থাৎ অন্তঃপুরে থাকিবার প্রথার সৃষ্টি হয়। কিন্তু অন্তঃপুরস্থ হইয়াও ঐ সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আর্য্য স্ত্রী ন্যায্য স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া আসিতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত বোম্বাই ও মাদ্রাজের ও বঙ্গদেশের পল্লিগ্রামস্থ স্ত্রীগণ। ব্রহ্মা পুনরায় আর্য্যসমাজের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিলে তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় নিজে সাক্ষাৎভাবে সমাজসংস্কার কিছু না করিয়া আর্য্যদিগের নিজের দ্বারা সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করাইতে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি আর্য্যদিগকে সমাজের পুরুষদিগকে একাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পরামর্শ দেন কিন্তু এই একাদশ শ্রেণী কি কি পুরাণে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

এই একাদশ শ্রেণীর মধ্যে শান্ত ও অশান্ত দুই শ্রেণী। তিনি অশান্ত উগ্রস্বভাব লোকদিগকে এক প্রকার অসম্পূর্ণগঠিত পুলিসের অধীনে রাখিলেন। তিনি কৃষ্ণকায় (অসিত) অনার্য্য কিন্তু সম্প্রতি

সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, আমাদের অন্তঃকরণে সেইরূপ বলবীর্য্য প্রেরণ কর—দিন দিন যেন আমরা তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতিতে প্রাণ পাইয়া অমৃত নিকেতনের পথে অগ্রসর হই।

৩০ ভাদ্র, রবিবার।

যিনি মহান্ বিশ্ববিধাতা পরব্রহ্ম এবং আত্মার অন্তরতম পরমাত্মা, তিনিই আমাদের গৃহদেবতা, তিনিই আমাদের কুলদেবতা, তাঁহাকেই আমরা প্রাতঃকালে আহ্বান করিতেছি—তিনি আমাদের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া হৃদয়ে বিরাজ করুন্—যেন তাঁহাকে আমরা দিনে নিশীথে আলোকে অন্ধকারে সম্পদে বিপদে সকল সময়েই হৃদয়ে দেখিতে পাই, তাঁহার পূজাই আমাদের আনন্দের প্রস্রবণ।

এ আনন্দ যথা-পরিমাণে উপার্জ্জন করিতে হইলে—ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করা একান্ত-পক্ষেই প্রয়োজন; ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাকে বলেন শ্রেয়ের পথ। সে পথের দুই সোপান—অকর্ত্তব্য-পরিহার এবং কর্ত্তব্য-সাধন। ক খ না শিখিলে যেমন ব্যাকরণ সাহিত্য পাঠে অধিকার জন্মিতে পারে না, তেমনি অকর্ত্তব্য পরিহার না করিলে কর্ত্তব্য সাধনে কাহারো অধিকার জন্মিতে পারে না। যে ব্যক্তি আপন গৃহের পরিবার বর্গের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, সে কি দেশের মঙ্গল সাধনে অধিকারী হইতে পারে? যে ব্যক্তি আপনার লোকের উপরে নিষ্ঠুরতাচরণ করে, সে কি অন্যের উপকার-সাধনে অধিকারী হইতে পারে? যে ব্যক্তি ক খ ভাল করিয়া শেখে নাই—সে কি রামায়ণ মহাভারত পাঠে অধিকারী হইতে পারে। অতএব অকর্ত্তব্য পরিহার করিয়া কর্ত্তব্য-সাধনে অধিকারী হইবে, কর্ত্তব্য সাধন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে। আত্মপ্রসাদই ব্রহ্মানন্দের সোপান।

অকর্ত্তব্য তিন প্রকার—শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক—তিনই পরিবর্জ্জনীয়।

শারীরিক অকর্ত্তব্য কি? না উপযুক্ত আহার-পান, উপযুক্ত আমোদ, উপযুক্ত ব্যায়ামাদি না করা; এবং অনুচিত আহার-পান এবং অনুচিত আমোদ প্রমোদ অভ্যাস করা।

মানসিক অকর্ত্তব্য কি? না জ্ঞানোপার্জ্জনে অবহেলা; সামাজিক ভদ্র-রীতি-নীতি শিক্ষা না করা; ধর্ম্ম-নিয়ম জানিতে চেষ্টা না করা।

আধ্যাত্মিক অকর্ত্তব্য কি? না পরপীড়া পরনিন্দা আত্মশ্লাঘা অকৃতজ্ঞতা বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, মিথ্যা কথন, অন্যায়াচরণ, স্বেচ্ছাচারিতা।

এই সকল কণ্টক বন পরিমার্জ্জিত না হইলে আনন্দের পরিবর্ত্তে ক্রন্দনই ঈশ্বরোপাসনার প্রধান অঙ্গ হয়। ক্রন্দন পরম মহৌষধি—তাহার বলে ঈশ্বরের করুণা আকৃষ্ট হয়; এবং ঈশ্বরের প্রসাদ-রূপী ধর্ম্মবল আবির্ভূত হইয়া কল্যাণ-পথের সমস্ত বাধা বিঘ্ন অপসারণ করিয়া দেয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যিনি—বিভীষিকার মধ্য দিয়াই হউক আর সদ্বুদ্ধির পরামর্শেই হউক্—অকর্ত্তব্যের পথ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, পরমারাধ্য পরমাত্মার পূজাতে তাঁহার আনন্দের উৎস সহস্রধারে উৎসারিত হয়। এরূপ যাঁহার হয়, তিনিই ধন্য—তিনিই সুখী। আত্মার প্রসন্নতা এবং আধ্যাত্মিক আনন্দ হইতে তখন আধ্যা-

ত্মিক পুণ্যবল উৎপন্ন হয়। এবং সেই বলে বলী হইয়া সাধক তখন কর্ত্তব্যের সোপানে উৎসাহের সহিত আরোহণ করেন। তখন তিনি শারীরিক নিয়ম পালন করিয়া বল উপার্জ্জন করেন—মানসিক নিয়ম পালন করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করেন—আধ্যাত্মিক নিয়ম পালন করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন—এবং সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত হৃদয়ের অভ্যন্তরে পরমদেবতা পরমাত্মার পূজা করিয়া বিমল আনন্দে প্লাবিত হন। তখন এই প্রার্থনা সহজেই তাঁহার মন হইতে উত্থিত হয়,

'দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান দেহ প্রীতি শুদ্ধ প্রীতি
তুমিই মঙ্গল আলয়।
ধৈর্য্য দেহ বীর্য্য দেহ তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ
বিবেক বৈরাগ্য দেহ দেহ ও পদ-আশ্রয়।'

হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসন্ন মুখ-জ্যোতিতে আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মেষিত কর—ভীষণ সংসার তরঙ্গে যাহাতে তোমাকে দেখিতে পাই যে তুমি কাণ্ডারী হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ—আমাদের উপরে মাতার ন্যায় জাগ্রত রহিয়াছ—পিতার ন্যায় আমাদের ভাবী মঙ্গলসূত্র উদ্ভাবন করিতেছ—সেই আশ্চর্য্য মনোহর জ্ঞানচক্ষু আমাদের হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রস্ফুটিত কর। তোমার দর্শনই আমাদের অন্ধকারের আলোক এবং রোগ শোক ভয়তাপের মহৌষধি।

৬ই আশ্বিন, রবিবার।

প্রতিমা পূজকেরা যেমন দেবপ্রতিমা চক্ষে উপলব্ধি করে, তেমনি আমরা পরমাত্মার সত্য সুন্দর মঙ্গল মূর্ত্তি জ্ঞানে উপলব্ধি করি। সহজ জ্ঞানে আমরা সর্ব্বত্রই সত্য সুন্দর এবং মঙ্গল দেখিতে পাই—মনুষ্যে দেখিতে পাই—পশুপক্ষীতে দেখিতে পাই—তরুলতাতে দেখিতে পাই—এমন কি নির্জ্জীব প্রস্তর পাষাণেও দেখিতে পাই। মার্জ্জিত জ্ঞানে আমরা তাহা আরো উজ্জল রূপে এবং পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাই। জ্ঞানের জ্যোতি যতই উদ্ভাসিত হইতে থাকে, ততই অসত্য এবং অমঙ্গলের বিভীষিকা শূন্যে পরিণত হইতে থাকে। মনুষ্য যদি আদিম কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত অসত্যের মধ্য দিয়া সত্যের আলোকে—কদর্য্যের মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্যের আলিঙ্গনে—অমঙ্গলের মধ্যদিয়া মঙ্গলের নির্ভয় রাজ্যে একপদ একপদ করিয়া অগ্রসর না হইত, তবে এই যে সকল পাঠশালা বিদ্যালয় পুস্তকালয়—জ্ঞানের সহস্র দীপাধার, এই যে সকল চিত্রশালা সঙ্গীতশালা—ভাবের উদ্দীপক, এই যে সকল চিকিৎসালয়, বিচারালয়, বিশাল রাজমার্গ পরিশোভিত নগর নগরী যেখানে প্রতিনিয়ত বাণিজ্য ব্যবসায় কারুকার্য্য এবং রাজ কার্য্যের স্রোত বাহিয়া চলিতেছে—মঙ্গলের অজস্র ধারা-বর্ষণ, এ সকল কোথায় থাকিত? মনুষ্যের জ্ঞান চিরকালই সত্য এবং মঙ্গলের জয় ঘোষণা করিতেছে—অসত্য এবং অমঙ্গলের পরাজয় ঘোষণা করিতেছে। জ্ঞানের হস্তে আরো এমনি এক আশ্চর্য্য চাবি রহিয়াছে যে, তাহাতে হৃদয়-মন্দিরের এবং জগৎ মন্দিরের দ্বার দুইই একসঙ্গে উদ্ঘাটিত হইয়া যায়; তাহা হইলেই আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে এখন যাহা মোহের অন্ধকার তখন তাহা সত্যের জ্যোতি হইয়া যায়—এখন যাহা বিচ্ছেদের প্রাচীর তখন তাহা প্রীতির বন্ধন হইয়া যায়—এখন যাহা ভয়ের উত্তরঙ্গ সমুদ্র তখন তাহা অমৃত নিকেতনের অটল সেতু হইয়া যায়। কিন্তু এরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে

নম্র সহিষ্ণু ঔদ্ধত্যবিহীন গর্ব্ববিহীন ভক্তিমান্ শ্রদ্ধাবান্ এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া অকর্ত্তব্য পরিহার, কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ এবং পরমাত্মার প্রতি নির্ভর নিতান্ত প্রয়োজন। সংসারের চতুর্দ্দিকে যদিচ সুখসম্পদের মোহজাল এবং দুঃখশোকের বিভীষিকা—কিন্তু আত্মার অটল জ্ঞানজ্যোতিতে আমরা সে সমস্ত ভেদ করিয়া দেখিতেছি যে, পরমাত্মা মঙ্গল-নিদান, বিঘ্নের কৃপাণ, মুক্তির সোপান। অতএব ভয় নাই—এখনি অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল কার্য্যে প্রবৃত্ত হও—এখনি পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ কর—এখনি তোমার সম্মুখ হইতে সমস্ত অমঙ্গল দলবল সমভিব্যাহারে পলায়ন করিবে।

হে পরমাত্মন্! তোমার সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলমূর্ত্তি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিয়া ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তোমাকে আমরা অর্চ্চনা করিতেছি, তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ কর।

১৩ আশ্বিন, রবিবার।

পরমাত্মাকে স্মরণ কর, স্থিরচিত্তে তাঁহার ভাব হৃদয়ঙ্গম কর—অন্তরে অনুভব করিয়া দেখ তিনি আমাদের কত মঙ্গল কামনা করেন। তিনি আমাদের শারীরিক মঙ্গল কামনা করিয়া শারীরিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, মানসিক মঙ্গল কামনা করিয়া মানসিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আধ্যাত্মিক মঙ্গল কামনা করিয়া আধ্যাত্মিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছার বলে এবং মঙ্গলনিয়মের অধ্যক্ষতায়—ভৌতিক বস্তু সকল শরীরের উপযুক্ত হইয়াছে—শরীর ভাব প্রকাশের উপযুক্ত হইয়াছে—মনের ভাব- সকল আত্মার অধিষ্ঠানের উপযুক্ত হইয়াছে এবং আত্মা তাঁহার অসীম করুণা অসীম স্নেহ এবং অসীম প্রেমের উপযুক্ত হইয়াছে। পরমাত্মা আমাদের পরম পিতা পরম মাতা পরম বন্ধু—তিনি আমাদের উপরে কত না মঙ্গল বর্ষণ করিতেছেন। শরৎকালের নদী নির্ঝরের বিমল ধারায় তাঁহার মঙ্গল-গীতের অমৃত ধারা উদ্গীরিত হইতেছে। হেমন্ত ঋতু আসিয়া ধান্যপূর্ণ শস্য ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর তাঁহার মঙ্গলগীতের নূতন সংস্করণ কনক অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া দিতেছে। নিস্তব্ধ রজনীতে তারকাগণের উদয়াস্তে তাঁহার মঙ্গলগীত প্রশান্তভাবে উঠিতেছে এবং প্রশান্তভাবে বিলীন হইতেছে। আমাদের আত্মা বলিতেছে উত্থান কর জাগ্রত হও। যাঁহার জ্যোতিতে প্রাতঃসূর্য্য জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিয়াছে, সেই জাগ্রত দেবতা পরমাত্মার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ লইয়া দিবা আরম্ভ কর। তাই আমরা পিতা মাতা পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগ্নী পতিপত্নী সকলে এক হৃদয়ে এক মনে একপ্রাণে সেই পরমদেবতা পরমাত্মার চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

হে পরমাত্মন্! আমরা সকলে মিলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছি। তোমার প্রসন্ন মুখজ্যোতিতে আমাদিগকে চিরদিন নিরাপদে রক্ষা কর। দিন দিন যেন তোমার প্রতি অনুরাগ আমাদের প্রাণের অভ্যন্তরে বদ্ধমূল হয়। কুবুদ্ধির কুমন্ত্রণা, কুসংসর্গের কুহকজাল এবং মোহের অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদের অন্তঃকরণে শুভ বুদ্ধির আলোক প্রেরণ কর, যাহাতে তোমার অমৃত নিকেতনের মঙ্গল সোপান দেখিতে পাই এবং সেই সোপান অনুসরণ করিয়া দিন দিন

তোমার অভয় ধামের নিকটবর্ত্তী হই, যেখানে তোমার আনন্দের সহস্রদ্বার আমাদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে।

২০ আশ্বিন, রবিবার।

সংসারের কোলাহলময় প্রবল স্রোত হইতে মনকে উচ্চে উঠাইয়া—আর আর সমস্ত বাক্য পরিত্যাগ করিয়া—পরমাত্মা যিনি বিশ্বভুবনের অধিদেবতা এবং যিনি আমাদের হৃদয়ের অধিদেবতা—যিনি আমাদিগকে একমুহূর্ত্ত ও বিস্মৃত হ'ন না, যিনি আমাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য অন্ন প্রেরণ করিতেছেন—আমাদের সম্মুখবর্ত্তী কর্ত্তব্যের পথ আলোকিত করিবার জন্য শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন—আমাদিগকে পাপতাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মঙ্গলের সোপান প্রস্তুত করিতেছেন—এই প্রশান্ত প্রাতঃকালে আমরা সেই পরম দেবতা পরমাত্মাকে প্রীতি পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিতেছি—এবং তাঁহার অটল আশ্রয় এবং অমোঘ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া দিবসের কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই ভয়াবহ সংসারে মঙ্গলময় পরমাত্মার ন্যায় পরম হিতৈষী বন্ধু আর আমাদের কেহই নাই—আমরা তাঁহার কথা শুনিব না, তবে আর কাহার কথা শুনিব? সংসারে এরূপ কপট বন্ধু অনেক আছে—যাহারা কুবুদ্ধিকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া মোহিনী বেশে সুসজ্জিত করে—অকর্ত্তব্যকে রাজ পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া কর্ত্তব্যের সিংহাসনে অধিবেশন করায়; উত্থানের পথে কণ্টক রোপন করে এবং পতনের পথ মাজিয়া ঘসিয়া পিচ্ছল এবং পরিষ্কার করিয়া দেয়। কিন্তু পরমাত্মার প্রেরিত শুভবুদ্ধি বিনা অলঙ্কারেই শোভমানা, তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মভাব রাজাড়ম্বর ব্যতিরেকেও প্রবল প্রতাপশালী, তাঁহার প্রদর্শিত মঙ্গলের পথ স্বতই পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ। অতএব আমাদের পরম হিতৈষী প্রিয়তম সুহৃৎ পরমাত্মা আমাদিগকে যাহা দান করেন—আমাদিগকে যে পথ প্রদর্শন করেন এবং সে পথে চলিলে আমাদিগকে যে আনন্দে অভিষিক্ত করেন—তাহাই আমাদের পরম মঙ্গল। যদি সুখ শান্তি চাও তবে মঙ্গলালয় পরমাত্মার ইচ্ছার অনুগত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ কর। নিশ্চিত জানিও যে অকর্ত্তব্যের পথে সুখ-শান্তি নাই; কর্ত্তব্যের পথে—কষ্ট এবং পরিশ্রম অনেক আছে, কিন্তু সমস্তই আনন্দের অব্যর্থ সোপান। অতএব প্রাতঃকালে হৃদয়ের সহিত পরম দেবতা পরমাত্মার আরাধনা করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে অল্প হউক অধিক হউক্ কোনো না কোনো সৎকার্য্যের অনুশীলন করিবে—যাহাতে আপনার মঙ্গল হয় বা অন্যের মঙ্গল হয়—জ্ঞান-লাভ হয়—সদ্ভাবের বিস্তার হয়—এরূপ কোনো না কোনো একটা মঙ্গল কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে; তাহা হইলে ক্রমে তোমাদের মনে অটল আত্মপ্রসাদ এবং গভীর শান্তি—করুণাময় পরমেশ্বরের সঞ্জীবনী প্রসাদবারি—রাত্রিকালের শিশির বিন্দুর ন্যায় নিঃশব্দে অবতীর্ণ হইবে; কোথা হইতে কখন আসিল—প্রথমে হয় তো তাহা জানিতেও পারিবে না। কিন্তু পরে বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি এবং আনন্দের অভ্যুদয়ে নিশ্চয়ই তাহার জন্য তোমার শুভবুদ্ধির প্রেরয়িতা পরম দেবতা পরমাত্মাকে হৃদয়ের সহিত বার বার ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবে না।

হে পরমাত্মন্! আমাদের মঙ্গলের পথ তোমার মুখ জ্যোতিতে আলোকিত

কর এবং আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ তোমার প্রেমসুধায় প্লাবিত কর। যাহাতে তোমার প্রসন্ন মুখের সম্মুখে আমরা আনন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি এবং পরিশেষে পাপতাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তোমাকে লইয়া আনন্দে—অমৃত নিকেতনে উত্থান করি, আমাদের প্রতি সেইরূপ প্রসাদবারি বিতরণ কর।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

১০ম প্রস্তাব।

আমরা মূল রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বালকাণ্ডের অহল্যাউদ্ধার পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছি। অতঃপর রাম ও লক্ষণ বিশ্বামিত্রের সহিত রাজর্ষি জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি ত্বরিতপদে পুরোহিত শতানন্দ ও ঋত্বিকগণকে অগ্রে লইয়া বিশ্বামিত্রের পূজা করিলেন এবং সহযাত্রী বীরদ্বয়ের সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। (বাল্মীকি রামায়ণ ৫০শ সর্গ)। ঋষি বিশ্বামিত্র তদুত্তরে রাক্ষসবিনাশ, অহল্যার শাপোদ্ধার, গৌতম সমাগম ও হরকার্ম্মুক দর্শনার্থ রাম লক্ষণের সমাগম নিবেদন করিলে, গৌতম ও অহল্যা পুত্র তেজস্বী শতানন্দ জননীর শাপমোচন সংবাদে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। এবং বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

অপিতে মুনি শার্দ্দূল! মম মাতা যশস্বিনী
দর্শিতা রাজপুত্রায় তপোদীর্ঘমুপাগতা। ৪শ্লোক ৫১ সর্গ

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কি রামচন্দ্রকে, দীর্ঘকাল ধরিয়া তপঃপরায়ণা (জড়বৎ পাষাণী নহে) যশস্বিনী আমার মাতাকে দেখাইয়াছিলেন, সেই তাপসী কি বনপুষ্পে রামচন্দ্রের সমুচিত সৎকার করিয়াছিলেন? আমার মাতা কি পিতার সহিত সমাগত হইয়াছেন? তেজস্বী রাম কি পিতৃপ্রদত্ত পূজা স্বীকার করিয়া এখানে আসিয়াছেন? ইনি কি প্রশান্তমনা মৎপিতা মহর্ষি গৌতমকে অভিবাদন করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন ত্রুটি কিছুরই হয় নাই। তোমার পিতা অহল্যার সহিত সমাগত হইয়াছেন। শতানন্দ রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন

স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ! দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য মহর্ষিমভিপূজিতম্।

"হে নরশ্রেষ্ঠ। তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ, এই পূজ্যপাদ মহর্ষির সহিত তোমার আগমন আমাদের ভাগ্যক্রমেই ঘটিয়াছে"।

আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, মাতৃশাপমোচনে উল্লসিত শতানন্দ, এই উপলক্ষে গললগ্নীকৃতবাসে বিষ্ণু অবতার বলিয়া রামচন্দ্রের স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়া দিবেন। কিন্তু মূলরামায়ণের বর্ণনা পাঠে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইল। শতানন্দ আরও বলিতে লাগিলেন, যাঁহার (বিশ্বামিত্রের) অতিসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য অতি আশ্চর্য্য, যিনি তপোবলে ব্রহ্মর্ষিত্ব অধিকার করিয়াছেন, সেই কৌশিক (অর্থাৎ বিশ্বামিত্র) আমাদের উভয়েরই হিতকারী, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। রাম! এই কঠোরতপা মহর্ষি যখন তোমার রক্ষক, তখন তুমিই একমাত্র ধন্য। এক্ষণে এই মহাত্মার যেরূপ তপোবল এবং যে প্রকারে ইনি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। পাঠকবর্গ ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন, রাজর্ষি জনকের পুরোহিত অহল্যার পুত্র শতানন্দ রামচন্দ্রে দেবত্ব ও অব-

তারত্ব দেখিলেন না, বরং মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে প্রাধান্য দিয়া তাঁহারই তপোবলের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন, ৫১শ সর্গ হইতে ৬৫শ সর্গ (বাল্মীকি রামায়ণ) তাহাতেই পর্য্যবসিত হইয়া গেল।

কিন্তু একবার অধ্যাত্ম রামায়ণ উদ্ঘাটন কর। ঐ পুস্তকের ঐতিহাসিক বিবরণই আমাদের সমালোচ্য। পূর্ণব্রহ্মের উদ্দেশে রামচন্দ্রের স্তবস্তুতিচ্ছলে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় এতই উচ্চদরের যে তৎসম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না। মূলরামায়ণের কবিত্বাংশ ও প্রাঞ্জলতা ছাড়িয়া দিলে, উহার ভিতর এমন কিছুই নাই, যাহার সহিত অধ্যাত্মরামায়ণের আধ্যাত্মিক ভাগের তুলনা হইতে পারে। শাস্ত্রের ভিতর দিয়া রাম অবতারের ক্রম বিকাশ দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য, একারণে ঐ সকল উৎকৃষ্ট স্থানের উল্লেখে আমরা বিরত রহিলাম। আমরা অবতারের পক্ষপাতী নহি, উপনিষদের ভিতরেও অবতার নাই, পুরাণের ভিতরেই অবতার লইয়া যত গোলযোগ। এই অবতারবাদের মূল অন্বেষণ করিতে গিয়াই আমাদিগকে এত কথা বলিতে হইতেছে। এই জন্যই আমরা দেখাইতেছি যে মহাকবি বাল্মীকি রামচন্দ্রে পূর্ণব্রহ্মের কল্পনা করেন নাই, কিন্তু পুরাণকার অধ্যাত্মরামায়ণের প্রথমছত্র হইতেই রামচন্দ্রকে অবতার করিয়া তুলিয়াছেন। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের ত কথাই নাই। প্রস্তাব কিছু দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে বলিয়া পাঠকগণকে প্রস্তাবের উদ্দেশ্য পুনরায় স্মরণ করিয়া দিতে হইতেছে। যাঁহারা এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে দুই একটি পাঠ করিয়া, উহাতে প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী কথা দেখিয়া, লেখকের উপর নিতান্ত কুপিত হইবেন, তাঁহাদের নিকট সবিনয় অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন আদ্যোপান্ত প্রস্তাবগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। আমি ইহাতে নিজের কথা বলি নাই, শাস্ত্র হইতে দেখাইয়া দিতেছি, যে অবতার বাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও সত্যের বিরোধী। গ্রন্থগণ পরস্পর বিরোধী, আমার অপরাধ কি।

অধ্যাত্ম রামায়ণের আদিকাণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে যে তাঁহারা জনকপালিত মিথিলা গমনোদ্দেশে গঙ্গাতীরে আসিয়া নদীপার মানসে নাবিককে আহ্বান করিলে, নাবিক আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল

ক্ষালয়ামি তব পাদ পঙ্কজং
নাথ দারু দৃষদো কিমন্তরম্
মানুষীকরণ চূর্ণমস্তি তে
পাদয়োরিতি কথা প্রথীয়সী।
পদাম্বুজং তে বিমলং হি কৃত্বা
পশ্চাৎ পরং তীরমহং নয়ামি
নোচেৎ তরী সদ্ যুবতী মলেন
স্যাচ্চেদ্বিভো বিদ্ধি কুটুম্বহানিঃ।

অর্থ। "প্রভু! শুনিতেছি যে তোমার পদদ্বয়ে মানুষীকরণ-চূর্ণ আছে, তোমার ঐ পাদরজস্পর্শে পাষাণ (অহল্যা) মানুষ হইয়াছে। কাষ্ঠ ও প্রস্তরে প্রভেদ কি? কি জানি যদি তোমার পদধূলি স্পর্শে আমার নৌকা মানুষ হইয়া যায়। অগ্রে তোমার পদাম্বুজ ধুয়াইয়া দিয়া পরে তোমাকে পার করিব"। এই বলিয়া নাবিক চরণ ধুয়াইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে পার করিল। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে এ কথার আদৌ উল্লেখ নাই।

এখানে অধ্যাত্ম রামায়ণকার সুকৌশলে সুললিত ছন্দের সাহায্যে পাঠকের ভাবকে (Emotion) এমনই উত্তেজিত ক-

রিয়া তুলিলেন, যে ঐ ভাবের উত্তেজনায় পাঠক মন্ত্র-মুগ্ধ। তাহার সাধ্য নাই যে সে ভক্তি-বিগলিত অশ্রু সংবরণ করিয়া এই ঘটনার মৌলিকতা সম্বন্ধে মনে সংশয়কে স্থান দিতে পারে। ষষ্ঠ অধ্যায় যে ছন্দে গ্রথিত, উল্লিখিত কয়েক পংক্তি সে ছন্দে রচিত নহে। রচনাকার যেন তাড়িতের সাহায্যে—মন্ত্রশক্তির প্রভাবে পাঠকের অজ্ঞাতসারে তাহাকে বিমোহিত করিয়া দিলেন। পুরাণকারগণ মনুষ্য-হৃদয় অতিসুন্দর রূপে বুঝিতেন, মনুষ্য হৃদয়ে কোথায় দুর্ব্বলতা আছে, তাহা তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতেন। পুরাণকারগণের নিকট সংমোহন অস্ত্রের অসদ্ভাব ছিল না। রচনা পারিপাট্য, স্তবস্তুতির মধুরতা, অনুপ্রাসের ছটা, ছন্দের মাধুর্য্য, বর্ণনার উৎকর্ষ, ফলশ্রুতির প্রলোভন, দেবদেবী পূজা সম্বন্ধে বাহ্যানুষ্ঠানের আতিশয্য, এই কয়েকটি লইয়া তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। এ তাবতের সাহায্যে মনুষ্য হৃদয়ের দুর্ব্বলতর অংশে এমনই আঘাত করিতেন, যে ভাবের উচ্ছ্বাসে জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িত, তাঁহারা যে দিকে ইচ্ছা করিতেন মনুষ্যগণকে ফিরাইতে পারিতেন, লোকেরাও অন্ধের ন্যায় তাঁহাদের হস্তে পরিচালিত হইত।

অধ্যাত্ম-রামায়ণকার কাষ্ঠের নৌকাকে স্বর্ণ তরণীতে পরিণত করেন নাই। কিন্তু বঙ্গভাষার পুরাণকার কৃত্তিবাসের হস্তে সেটুকু ঘটিয়াছে। পাঠকগণের জন্য আমরা কৃত্তিবাস হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এইরূপে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে
তিনজনে চলিলেন গঙ্গার কূলেতে
পাষাণ হইল মুক্ত কৈবর্ত্ত তা শুনে,
নৌকাখানি লইয়া সে পলাইল বনে।
কৈবর্ত্তকে ডাকিয়া কহেন তপোধন,
না আইলে ভস্ম আমি করিব এখন।
... ...
তবে যদি আজ্ঞা মোরে কর তপোধন
স্কন্ধে করি করি পার যাহ তিন জন।
কোথা হতে আনিলা এ পুরুষ সুন্দর
পায়ের পরশে মুক্ত করিল প্রস্তর।
... ...
নৌকা মুক্ত হয় যদি লাগে পদধূলি
কি দিয়া পুষিব আমি বল পোষ্যগুলি।
... ...
যদি বল শ্রীরামের চরণ ধোয়াই
নতুবা লাগিলে ধূলি তরণী হারাই।
তরণীতে ত্বরায় করিতে আরোহণ
ধোয়াইল কৈবর্ত্ত শ্রীরামের চরণ।
... ...
শুভদৃষ্টে শ্রীরাম চাহেন তার পানে
হইল সুবর্ণময়ী তরণী তৎক্ষণে।

কথকের পুঁথি এই সকল উপাদান হইতেই সংগৃহীত। এ কারণে রামাবতারে বিশ্বাস জনসাধারণের পক্ষে দুরতিক্রমণীয় ও তাহাদের অস্থিমজ্জায় বিজড়িত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, যে পুরোহিত শতানন্দ,মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোবল বিষয় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। প্রজাপালন কার্য্যে রত থাকিয়া একদা তিনি চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে অবনী পরিভ্রমণার্থ নিষ্ক্রান্ত হইয়া বশিষ্ঠদেবের তপোবনে সমুপস্থিত হইলেন। অগণ্য সেনাদলে তপোবন পূর্ণ হইয়া গেল। বশিষ্ঠের আগ্রহাতিশয়ে, সসৈন্য বিশ্বামিত্রকে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিতে হইল। বশিষ্ঠ নিজ কামধেনুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, শবলে! তুমি রাজযোগ্য ভোগ্য-সামগ্রী ও মধুরাদি ছয় রসের মধ্যে যিনি যাহা চাহেন, এরূপ সরস ভক্ষ্য পেয় সৃষ্টি করিয়া আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর। শবলা

ঋষির আদেশক্রমে ইক্ষু মধু, গৌড়ী মদ্য, পর্ব্বতাকার উষ্ণ অন্নরাশি, পায়স, সূপ এবং সুস্বাদু খাণ্ডবপূর্ণ বহুসংখ্য রজতময় ভোজন পাত্র ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি করিল। ঋষিকৃত সৎকারে বিশ্বামিত্র অতিশয় আনন্দলাভ করিয়া বশিষ্ঠকে বলিলেন, আপনার শবলা রত্নবিশেষ। রত্নে রাজারই স্বামিত্ব আছে। আপনাকে আমি লক্ষ ধেনু প্রদান করিতেছি, আপনি আমাকে তাহার বিনিময়ে শবলা দান করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, লক্ষ ধেনুর কথা কি বলিতেছেন, আপনার রাজত্বের বিনিময়েও আমি শবলা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠকে স্বীয় প্রার্থনা পূরণে অসম্মত দেখিয়া বলপূর্ব্বক ধেনু লইয়া চলিলেন। শবলা নিতান্ত ক্ষিণ্নমনে বশিষ্ঠকে বলিল, সত্য সত্যই কি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি না। রাজা বলপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন। ইনি বলবান রাজা, আমাপেক্ষা বলশালী, বিশেষতঃ ইনি আজ আমার অতিথি। অতিথিকে বধ করা যুক্তিযুক্ত নহে। শবলা বলিল, ক্ষত্রিয়ের বল যৎসামান্য, ব্রাহ্মণের বল অলৌকিক বলিয়া প্রথিত আছে। বিশ্বামিত্র মহাবলপরাক্রান্ত হইলেও আপনাকে কখনই পরাস্ত করিতে পারিবেন না। আপনি আমাকে নিয়োগ করুন। আমি ঐ দুর্ব্বৃত্তের বল চূর্ণ করিয়া দিই। বশিষ্ঠ আদেশ দিলেন। শবলা হম্বা রব পরিত্যাগ করিবামাত্র অসংখ্য পহ্লব কাম্বোজ ও যবন সেনা প্রসূত হইল। বিশ্বামিত্রের অশ্ব রথ পদাতি তাবৎই বিনষ্ট হইয়া গেল। বিশ্বামিত্রের শতপুত্র আয়ুধ হস্তে বশিষ্ঠের অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহাদিগকে মহাবেগে আসিতে দেখিয়া তিনি হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন। বিশ্বামিত্রের আত্মজেরা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল। ক্ষত্রিয়বীর্য্য ব্রহ্মতেজের নিকট বিকুণ্ঠিত দেখিয়া, বিশ্বামিত্র হিমালয়ে গমন করত ভগবান ব্যোমকেশকে প্রসন্ন করিবার জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে মহাদেব তৎসকাশে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কিরূপ বরে তোমার অভিলাষ। বিশ্বামিত্র বলিলেন, যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত সরহস্য ধনুর্ব্বেদ আমাকে প্রদান করুন। শূলপাণি তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। *

অনন্তর বিশ্বামিত্র পর্ব্বতকালীন সমুদ্রের ন্যায় বলবীর্য্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া মনে করিলেন, এইবারে বশিষ্ঠ নিশ্চয়ই আমার হস্তে নিহত হইবে। এইরূপ

* ইন্দ্র বা মহাদেবের নিকট গমন করিয়া অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবার বিষয় প্রায়ই বিভিন্ন শাস্ত্রে পাঠ করা যায়। আমাদের মনে হয়, ইন্দ্র বা মহাদেব নামধারী বীরগণ বংশের নামেই আখ্যাত হইতেন। বর্ত্তমান কালে যুবকগণ যেমন ইউরোপে গিয়া বিজ্ঞান জ্যোতিষ প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন, পূর্ব্বকালে তেমনি রাজকুলোদ্ভব যুবকেরা, বীরজাতীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ নিপুণ ভারতবর্ষের সীমান্তনিবাসী ইন্দ্র ও মহাদেবাদির নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিতেন। তাঁহাদের কৃপা লাভ করিবার জন্য বহুকালব্যাপী সাধ্য সাধনার আবশ্যক হইত। এবং তাঁহাদিগকে পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট করিতে পারিলে তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। সম্ভবতঃ বেদোক্ত মেঘের দেবতা ইন্দ্র ও সংহার কর্ত্তা মহাদেবের সহিত, পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ ইঁহাদিগকে মিশাইয়া গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছেন। নতুবা মহাদেব ও ইন্দ্রের সহিত মনুষ্যজাতির সৌহার্দ্দের সম্ভাবনা কোথা। বর্ত্তমানকালেও হিমালয়ের পার্ব্বত্যজাতি বৃষে আরোহণ করিয়া দূরদেশে গিয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে আমরা এই পত্রিকার ১৮১৫ শকের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবুর হিষ্টরী অব্ দি প্রিমটিভ এরিয়ান্ নামক প্রস্তাব পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত স্ত্রীলোকদিগকে গৌর (সিত) আর্য্য স্ত্রীগণের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। এই সিত ও অসিত বিভাগ ব্যতীত তিনি স্ত্রীলোকদিগকে অন্যান্য বিভাগেও বিভক্ত করিলেন। তাঁহার এইরূপ করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে আর্য্য স্ত্রীগণ অনার্য্য স্ত্রীগণের সহবাসে থাকিয়া নৈতিক অবনতি প্রাপ্ত না হয়। বিগত বিপ্লবে এই সহবাসের ফল আর্য্যসমাজ বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিল। এইরূপ সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের পর ভাগবৎপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মা এক রূপ অসম্পূর্ণ দণ্ডনীতি ও অপর নীতি সকলের ব্যবস্থা করিয়া আর্য্য সমাজের সুশৃঙ্খলার ও সুশাসনের উপায় করিলেন।

ব্রহ্মা প্রথমে কেবল মাত্র ভাব ও মতের আকারে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সকল শ্লোককে এক্ষণে শ্রুতি বলা যায় তাহা মধ্য আশিয়ায় বিরচিত হয় নাই। ভারতবর্ষে রচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? অবশ্য মধ্য আশিয়ায় দেবতাদিগের স্তব লিখিত না হউক বিরচিত হইয়াছিল। কিন্তু যাহা বিরচিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহার কিছু মাত্র পাওয়া যায় না। ভাগবৎ পুরাণে উল্লিখিত আছে যে প্রথমে তিন বেদ ছিল না, এক বেদ ছিল কিন্তু এক্ষণে সেই মূল বেদের কিছুই পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় শ্লোকে "নূতয়ে রুত" এই বাক্য আছে, ইহাতে বোধ হইতেছে যে ভারতবর্ষে যাহা কিছু হইয়াছে সব নূতন।

ব্রহ্মা আর্য্যজাতিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। ব্রাহ্মণদিগকে পূজা অর্চ্চনা, ক্ষত্রিয়দিগকে যুদ্ধ, বৈশ্যদিগকে কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্যে এবং শূদ্রদিগকে দাসকার্য্যে নিযুক্ত করেন। জাতিবিভেদ প্রথমে বংশগত ছিল না, বৃত্তিগত ছিল। ব্রহ্মা মানবজীবনকে চারি অবস্থায় বিভক্ত করেন। প্রথম ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিতীয় গার্হস্থ্য, তৃতীয় বানপ্রস্থ, এবং চতুর্থ সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থায় মানব সাংসারিক অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া কেবল মাত্র অধ্যয়ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। গার্হস্থ জীবনে মানব স্বীয় পরিবার সহিত জনসমাজে বাস করিবে। বানপ্রস্থ অবস্থায় মানব একা কিম্বা স্ত্রী সহিত অরণ্যে বাস করিবে এবং সন্ন্যাস অবস্থায় পৃথিবীময় ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম উপদেশ দিবে। মানুষ একেবারেই যে সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না সে বিষয়ে ব্রহ্মা বিশেষ বিধি দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মানব গার্হস্থ অবস্থায় কিছুকাল যাপন না করিয়া কখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারিবে না। ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, ধনুর্ব্বেদ ইত্যাদি কতকগুলি উপবেদেরও প্রথম সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার মুখ হইতেই সর্ব্বপ্রথমে সকল শব্দ অপেক্ষা গভীর ও শ্রেষ্ঠ শব্দ প্রণব উচ্চারিত হয়। উহা এমনি দীর্ঘ ও গভীর রূপে উচ্চারণ করিবার প্রথা যেন উহা দ্বারা সমস্ত আকাশ একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল বোধ হয়। প্রণব লিখিত আকারে হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান সাঙ্কেতিক চিহ্ন। এমন কি, হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরাও প্রণব ব্যবহার করিয়া থাকে।

যক্ষ ও রক্ষ নামক দুই নিকট সম্পর্কীয় অসভ্য জাতিকে ব্রহ্মা রণে পরাজিত করিয়া বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছিলেন। যক্ষ জাতি জক্‌সার্টিস নামক নদীর তটে বাস করিত। রাক্ষস জাতি অক্‌সস্ নদীর তীরে বাস করিত। বোধ করি এই দুই নদী

ঐ দুই জাতি হইতেই তাহাদের স্বীয় স্বীয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বোধ হয় সমরকণ্ড অর্থাৎ সমরখণ্ড নামক স্থানে ঐ দুই বর্ব্বর জাতির সহিত ব্রহ্মার যুদ্ধ হয়। বোধ হয় এই যুদ্ধ হইতে ঐ প্রদেশের নাম সমর-খণ্ড অর্থাৎ যে খণ্ডে যুদ্ধ হইয়াছিল হইয়াছে। ভাগবৎ পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে যক্ষগণ নরমাংস ভক্ষণ করিত। এক সময় এই দুই জাতির দেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময় যক্ষ এবং রাক্ষসগণ ব্রহ্মার বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। যক্ষগণ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে "ইহাকে খাইয়া ফেল" "ইহাকে খাইয়া ফেল" এবং রাক্ষসগন "ইহাকে বাঁচিতে দিওনা" "ইহাকে বাঁচিতে দিওনা," এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অব-শেষে ব্রহ্মা এই দুই নিষ্ঠুর ও ভয়ানক অসভ্য জাতিকে পরাজিত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে নিজের বশ্যতা স্বীকার করান, কিন্তু তাঁহার অসভ্য প্রজাদিগের অসভ্য আচরণে ব্রহ্মাকে অন্য অনেক প্রকারে কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। ভাগবৎ-পুরাণে লিখিত আছে যে অসুর অর্থাৎ একপ্রকার তুরাণী জাতীয় লোক ব্রহ্মার উপর অস্বাভাবিক কোন অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি এই জঘন্য বর্ব্বরদিগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই ঘটনা সকল দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৈদিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে মধ্য এসিয়ার জাতিদিগের মধ্যে ভয়ানক নৈতিক অবনতি বিদ্যমান ছিল। বৈদিক ধর্ম্মের যখন অভ্যুত্থান হয় তখন উক্ত ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে এমন ধর্ম্মোন্নতির স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল যে তাহাদের প্রায় সকলেই সত্যনিষ্ঠ সদাচার-পরায়ণ হইয়াছিল। এই জন্য সেই আদিম বৈদিক যুগ আজ পর্য্যন্ত সত্য যুগ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে *।

পত্র।

ভারতবর্ষীয় স্বাধীন আর্য্যমিসনের কা-র্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রচারক প্রার্থনা করিয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহা-শয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা প্রকাশ করা গেল।

ভক্তিভাজন মহর্ষি শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয় মহিমার্নবেষু—

মহর্ষে!

উপনয়নকালে আমরা যে পবিত্র গা-য়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম এবং কয়েক দিন দণ্ড ধারণ করিয়া যে সন্ধ্যা-বন্দনা অভ্যাস করিয়াছিলাম, তৎকালে তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতাম না, শিক্ষিত পক্ষীর ন্যায় কেবল তাহার বর্ণ উচ্চারণ করিয়া দৈনিক কার্য্য সম্পাদন করিতাম। আচার্য্য কহিয়া দিয়াছিলেন এক গায়ত্রী মন্ত্রে সকল দেবতার পূজা হয়, আমরা তাহাই বিশ্বাস করিয়া প্রতিদিন গৃহদেব-তার অর্চনা করিতাম। তাহার পর ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বারা প্রকাশিত "গায়ত্র্যর্থ" এবং "উপাসনাবিধি" পাঠ করিয়া আমা-দের চৈতন্য হইল। তখন বুঝিলাম "জগৎ-প্রসবিতা পরমদেবতা" কে, এবং কি প্র-কারে উদ্বোধন করিয়া তাঁহার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হয়। তাহার পর এইরূপ অর্থযুক্ত ভাষার যত আলোচনা হইতে লাগিল ততই হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান

---

* সাহিত্য "পত্রিকায় কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।"

প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল—পরা এবং অপরা বিদ্যার ভাব সম্যক উপলব্ধি হইতে লাগিল। তখন আমাদের সহজ জ্ঞানে এই বিশ্বাস হইল যে ব্রাহ্মসমাজ "ব্রহ্মবিদ্যার আলয়," সেখানে সাম্প্রদায়িকতার ভাব স্থান পায় না, প্রত্যুত যত যত আপনার অতুলনীয় ব্রহ্মবিদ্যার সার "ব্যাখ্যান" পাঠ করিতে লাগিলাম, ততই আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল। তাহার পর কোথা হইতে এক ভয়ঙ্কর বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইল ... ...

... যাহারা পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতাকে আদর্শ করিয়া দেশের উন্নতি করিতে চাহে তাহাদের সংখ্যা কালবশতঃ অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া উঠিল। তৎকালে আপনার ন্যায় দূরদর্শী ভারতবন্ধু তাহার পরিণাম বুঝিতে পারিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। আমরা তাহা দেখিয়া নিস্তব্ধ হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেলাম। তাহার পর গত ৩০ বৎসরের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন আপনার দূর দৃষ্টি কতদূর সমীচীন ছিল। আপনি সে সময়ে সে ভাবে আদি সমাজকে রক্ষা না করিলে যে আজি কি অবস্থায় তাহার গতি ফিরিয়া দাঁড়াইত তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতেছে। আমার "অফিসিয়াল ক্যারিয়ার" নামক পুস্তকে এ বিষয়ের যথেষ্ট আভাস দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশার পথ প্রশস্ত না হইলে আমরা কখনই আর্য্যসমাজ নাম দিয়া এক নূতন সমাজ গঠন করিতে যত্ন পাইতাম না। ভারতের দুর্দিনের অবস্থা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আপনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আপনার "ব্যাখ্যান" এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর "ভাষ্য ভূমিকা" তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। দুঃখের বিষয় এই, যে, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আপনার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। আপনি জরাগ্রস্ত হইয়া সংসারকে পশ্চাৎগত করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। এ সময়ে আমাদিগের প্রতি করুণা নয়নে দৃষ্টিপাত করে, আপনি ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি কোথাও বর্ত্তমান দৃষ্ট হইতেছে না। আপনি মর্ত্ত্যে থাকিয়া যে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন তাহার প্রসাদ যদিও আমরা সময়ে সময়ে পাইতেছি তথাপি তাহার আশা আর কত কাল? তাই আপনার নিকট এই নিবেদন করিতেছি যে আপনি এ সংসারে বর্ত্তমান থাকিতে যাহাতে নবীন আর্য্যসমাজ আপনার স্নেহচক্ষের সম্মুখে আইসে তাহার উপায় বিধান করিয়া পূর্ণকাম হউন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আমরা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে পাঞ্জাবে আহ্বান করিয়া এ বিষয়ের অনেক মন্ত্রণা করি। তাহার সবিস্তার বিবরণ আমায় উপরোল্লিখিত পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। প্রথম যে দিন লাহোরে আর্য্যসমাজ সংস্থাপিত হয় সে দিন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিতে আমাকে আচার্য্যরূপে বরণ করা হয়। আমি শাস্ত্রব্যবসায়ী নহি, সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞানের সমূহ অভাব থাকায় কিরূপে সমাজের কার্য্য চলিবে তাহার আন্দোলন করি। তাহাতে এই স্থির হয়, যে, আপনার প্রণীত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামক পুস্তক এবং "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" সাদরে গৃহীত হইবে। তাহার পর হইতে যতকাল আমি

পাঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেছিলাম ততকাল আদি সমাজের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সমাজের কার্য্য সম্পাদন করিতাম। তাহার পর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কয়েকখান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ("আর্য্য বিনয়," "পঞ্চ মহা-যজ্ঞ বিধি," "ঋগ্বেদ ভাষ্য ভূমিকা" এবং "সত্যার্থ প্রকাশ") এ সকল পুস্তক এখন আর্য্য সমাজের সম্পত্তি হওয়ায় তদনুসারে সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। তখন হইতে ভারতে "স্বাধীন আর্য্যমিসন" নাম দিয়া আপনার কার্য্য চালাইতেছি। আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের অনেক গণ্য মান্য সভ্য এবং উপাচার্য্য আর্য্যসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করি-তেছেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্নে আর্য্য সমাজের সভ্যদিগের আদি সমাজের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তাই সে দিন বড়বাজারের (ক্লাইভষ্ট্রীটের) আর্য্য সমাজের সভ্যেরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আপনিও পিতার ন্যায় প্রীতি প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে যে সকল সদুপদেশ দিয়াছিলেন তাহার ফলেই সে দিন আদি সমাজ মন্দিরে পণ্ডিত মুনিরামের ব্যাখ্যান হয়। এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে উভয় দল একটু একটু অগ্রসর হইলে আপনার সাধু ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে আর কালবিলম্ব হয় না। কি উপায়ে এ কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে তাহা আপনার ন্যায় পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিবেচনা করিবেন। আমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল, যদি সুবিবেচনা বলিয়া অবধারিত হয় তবে সেই মত কার্য্য করিলে আমার জীবনের একটী কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে।

আজি কালি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রায় তিন শতের অধিক আর্য্যসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহার সভ্য সংখ্যাও বহু সহস্র হইবে। তাহাতে অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি যোগ দিয়াছেন। কয়েক জন মহারাজা, রাজা এবং গভর্ণমেণ্টের উচ্চ পদস্থ কর্ম্ম-চারী তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের সকলের এই মত যে, আর্য্য সমাজের কার্য্যপ্রণালী ভারতব্যাপী হয়, সেই জন্য এক প্রচার ফণ্ড সংস্থাপিত হই-য়াছে। তাহা দ্বারা অর্থ সাহায্য পাইয়া আর্য্য সমাজের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা দেশ দেশান্তরে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতে-ছেন। কলিকাতায় এ বিষয়েরও উদ্যোগ হইতেছে, কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এত হীন, অথবা পলিটিকাল রঙ্গ-ভূমি এত গরম, যে, এ সকল বিষয়ের গুরুত্ব আদবেই আমরা বুঝিতে পারি-তেছি না। এমন অবস্থায় আপনার শরণা-গত না হইলে এ দেশের জন্য আমরা আর কি করিতে পারি? তাই ভাবিতেছি যদি আপনি কৃপা করিয়া দুই চারি জন শিক্ষিত পণ্ডিত ভারতবর্ষের আর্য্য সমাজ পরিদর্শন করিতে পাঠান, তাহা হইলে একতার পথ শীঘ্র প্রশস্ত হইয়া পড়ে।

আপনার একান্তানুগত

শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সংবাদ।

গত ৩০ ভাদ্র রবিবার চুঁচড়া প্রবাসী আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ ও তাঁহার স্বর্গীয়া মাতা ঠাকু-রাণীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ কার্য্য আদি সমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। এই কার্য্যে শ্রদ্ধা-স্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

সেতারা প্রার্থনা সমাজের অভিনন্দন পত্র।

MRAHMA KRIPAHI KEVALAM.

TO

Maharshi Devendra Nath Tagore
Pradhanacharya of the Adi Brahma Samaj
Calcutta.

Satara Prarthana Samaj
26th August 1895.

Revered Sir

We, the undersigned residents of Satara and members of the Satara Prarthana Samaj, beg to approach you with feelings of love and esteem and convey to you, through your beloved and worthy son Babu Dvijendra Nath, our grateful acknowledgments of the good you have done, not only to the people of Bengal, but to the whole of India, by leading the great Theistic Movement, begun by Mahatma Raja Ram Mohan Roy in earnest and catholic spirit. We take this occasion to specially bring to your notice the great and valuable help which your sons and members of your family have always cheerfully given us here in Satara in carrying on the work of Reform, and especially of Religious Reform. It is our fervent prayer to the Almighty that He may give you long life and good health to enable you to see your efforts in the cause of True Religion bear fruit, and that your descendants may continue, as they have been doing, the good work you have so much at heart, from generation to generation.

We beg to subscribe ourselves,
Most Revered Sir
Your ardent admirers,

Chintaman Narayan Bhat
Kashinath B. Marathe,
Raoji Ramchandra Kale.
Wamon Sitaram Sakhawalkar.
Dattatraya Narayan Nabar
Manohar Raghunath Shimpi.
Nana Muljee.
Ramji Shivji Barber.
Bhokubin Raghu Patankar.
Waman Narayan Rangnikar.
B. M. Kharker.
Damodar Gangadhar Divekar
Sayunna Sayee,
Sitaram Yadavrao Javere
(Soubhagyavati) Anandibai Bhat
,, Vithabai Javere.
,, Sitabai Nabar.
,, Satyabhamabai Kale.

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের ছবি পাইয়া বিদেশস্থ বন্ধুগণের উক্তি।

Dorking.
August 8. 1865.

K. N. Tagore Esq.
Secy. Adi Brahmo Samaj.

Dear Sir

I am away from home and have not seen the photograph which I hear has duly arrived there. I beg to return you my very warmest thanks for a picture of my beloved and venerated friend which I shall treasure all my life and hand on to my children to treasure likewise. With grateful regards.

Iam
most sinserely yours
Charles Voysey

R. N. Tagore Esq.
Secy. Adi Brahmo Samaj.

Brahma Kripahi Kevalam.
Southern India Brahma Samaj Office.
97, Annapillai Street, Black Town,
Madras, 12 August 1895.

Dear Sir,

With the sincere and hearty respects of the congregation I beg to acknowledge the receipt of your very valuable and brotherly letter of the 3rd August 1895 and also a copy of Photograph of our Venerable father Sreeman Maharshi Debendra Nath Tagore with his parental blessings.

We humbly pray to the All merciful that He may pour forth His choicest blessings on the family of our venerable father. In conclusion I pray your good self will be pleased to accept my own sincere respects.

I beg to remain
Ever yours very faithfully,
Ranganatham Nayudu.
Congregational Secretary.

THE PATRIARCH OF THE ADI SOMAJ, CALCUTTA.—Only a few of our readers may know that an eminent man in Calcutta sixty-six years ago succeeded Rammohun Roy. We had the great pleasure of receiving a fine photo of the aged preacher a few days ago. It is a remarkable face. The Christian Life and Unitarian Herald. London Aug.17, 1895.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬, শ্রাবণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৫২৪॥৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১৮১।১১
সমষ্টি	৩৭০৫৸৶১১
ব্যয় ...	৫৭৩ /৩
স্থিত	৩১৩২৸৵৮

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৯৪৵৬

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১৯০৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা) ১৮১৬ শকের বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত	১৲
পুরাতন বাতিল কাগজ বিক্রয়ের মূল্য	৩৵৬
	১৯৪৵৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৬।৵০
শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় হালিসহর	৩।৵০
" " সুরেশনাথ রায় জাড়া	৩৸০
" " কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রতাপকাটি	৩০
" " মহেন্দ্রনাথ সেন ডিব্রুগড়	৩।৵০
" " লালা গণেশপ্রসাদ রাজ দ্বারভাঙ্গা	৩।৵০
" " দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা) কলিকাতা	
শ্রীযুক্ত বাবু কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত ঐ	১॥০
" " গোবিন্দকুমার চৌধুরী ঐ	৩৲
৺ " জয়গোপাল সেন ঐ	১৲
দুই সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয়	৸০
	২৬।৵০

পুস্তকালয়	৭॥০
যন্ত্রালয়	২৯৪।৵৬
গচ্ছিত	।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	২৲
সমষ্টি	৫২৪॥৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩৫৯।৵৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৭৸/৬
পুস্তকালয় ...	৪৭৸৶৯
যন্ত্রালয় ..	১২৭॥৶৯
গচ্ছিত ...	/৬
সমষ্টি	৫৭৩/৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

১৮ই আশ্বিন শুক্রবার কালনা ব্রাহ্ম-সমাজের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও সায়ংকালে ব্রহ্মো-পাসনা ব্রহ্মসঙ্গীত ও ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন হইবে, ভক্ত বিশ্বাসী ও দর্শক মহাশয়গণ উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।
প্রথম ভাগ।
কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৬।

৬২৭ সংখ্যা। ১৮১৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে
গার্হস্থ্য উপাসনার সময়

আচার্য্যের উপদেশ।

২৩ ভাদ্র। রবিবার।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ; ব্রাহ্মধর্ম্ম কল্যাণের প্রস্রবণ। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মার উপজীবিকা—দেশস্থ ভ্রাতৃগণের ঐক্যের নিদান—গৃহস্থ পরিবারবর্গের হৃদয়ের শান্তিসুধা—সমস্ত লোক-সমাজের আধ্যাত্মিক বন্ধন-সূত্র।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র ঈশ্বরের উপাসনা। ঈশ্বরোপাসনার দুই শাখা—নির্জ্জনে ঈশ্বরোপাসনা এবং সজনে ঈশ্বরোপাসনা। অথবা তিন শাখা—নির্জ্জনে ঈশ্বরোপাসনা, গৃহে ঈশ্বরোপাসনা এবং সমাজে ঈশ্বরোপাসনা।

গৃহে দেবোপাসনা পূর্ব্বকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশে গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য সভ্যজাতির মধ্যেও গৃহে গৃহে দেবোপাসনা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বতন বলবিক্রমশালী রোমীয়েরা গৃহদেবতার পূজা না করিয়া কোনো কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইত না—পূর্ব্বতন সাম্রাজ্য-শালী পারসীকেরা গৃহের হোমাগ্নি কখনই নির্ব্বাণ হইতে দিত না। নব্য ইউরোপেও ঈশ্বরোপাসনা প্রাতঃকালে এবং শয়নের প্রাক্‌কালে গৃহে গৃহে নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

হৃদয়ে পরমাত্মার আবির্ভাব হইলে মনুষ্যের প্রাণ দ্বিগুণিত হয়—মর্ত্ত্য জীবনের অভ্যন্তরে অমৃত জীবনের সূত্র সঞ্চার হয়। তেমনি গৃহে পরমাত্মার পূজা প্রতিষ্ঠিত হইলে গৃহের বন্ধন দ্বিগুণিত হয়—পিতামাতাতে সেই পরমপিতা এবং পরম মাতার ছবি নিপতিত হয়, ভ্রাতৃগণের সৌহার্দ্দবন্ধনে সেই পরম সুহৃদের ছায়া সংক্রমিত হয়, পতিপত্নীর বিমল প্রেমে সেই আনন্দ-স্বরূপের অমৃতরশ্মি নিপতিত হয়—এইরূপে গৃহের শ্রী সমুজ্জ্বল হইয়া তাহা অমৃত-নিকেতনের সোপান হয়।

আমরা দেখিতে পাই যে, কোনো বস্তু ধরিয়া তুলিবার সময় হস্তের সকল অঙ্গুলি এক সঙ্গে সঙ্কুচিত হয় এবং কোনো ধৃত-

বস্তু ছাড়িয়া দিবার সময় সকল অঙ্গুলি এক সঙ্গে বিকসিত হয়। কেন এরূপ হয়? না অঙ্গুলি যদিচ পাঁচ কিন্তু প্রাণ এক—সেই একের গুণে পাঁচ অঙ্গুলি পাঁচ হইয়াও এক। প্রাণ চলিয়া গেলেই পাঁচ অঙ্গুলি পাঁচশত ভাগে বিভক্ত হইয়া পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়। হৃদয় হইতে হস্তের মধ্যদিয়া যেমন পাঁচ অঙ্গুলিতে প্রাণের সঞ্চার হয়, তেমনি পরমাত্মার স্বর্গীয় ভাণ্ডার হইতে আত্মার মধ্য দিয়া হৃদয়ের পাঁচবৃত্তিতে এবং গৃহের পাঁচ অঙ্গে পুণ্য প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়! সে পাঁচবৃত্তি—ভক্তিশ্রদ্ধা সৌহার্দ্দ প্রীতি স্নেহ এবং দয়া, সে পাঁচ অঙ্গ পিতামাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, পতিপত্নী পুত্রকন্যা এবং দাসদাসী। শারীরিক প্রাণ অন্ধ—আধ্যাত্মিক প্রাণ জাগ্রত। শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয় হইতে নখাগ্রপর্য্যন্ত প্রাণ প্রবাহিনী রক্তস্রোত নিরন্তর তরঙ্গিত হইতেছে, অথচ তাহাতে আমাদের জ্ঞানের কোনো হস্ত নাই। কিন্তু পরমাত্মা আমাদের জ্ঞানের হস্তে তাঁহার অমৃতভাণ্ডারের চাবি দিয়াছেন; তাঁহার সে ভাণ্ডার হইতে আধ্যাত্মিক প্রাণ উপার্জ্জন করিতে হইলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা চাই—উজ্জ্বল জ্ঞান চাই, নির্ম্মল প্রেম চাই। কিন্তু আমাদের চেষ্টাই প্রধান—চেষ্টা থাকিলে আর আর যাহা কিছু আবশ্যক, ঈশ্বর প্রসাদে সমস্তই যথাসময়ে পূরণ হইবে—প্রসুপ্ত জ্ঞান উদ্বোধিত হইবে—মুকুলিত প্রেম বিকসিত হইবে। গার্হস্থ্য ঈশ্বরোপাসনা পরিবারবর্গের হৃদয়ের সম্মিলন এবং সম্মিলিত হৃদয়ের উৎস উৎসারণ। সমস্তই হৃদয়ের ব্যাপার—তাহার কিছুই চক্ষে উপলব্ধি হইতে পারে না। যাঁহার অন্তর হইতে যাহা উৎসারিত হয়, তাঁহারই তাহা অন্তরে উপলব্ধি হয় এবং অপরের তাহা বাহিরে ভাবে এবং ফলে উপলব্ধি হয়। অন্যেরা যখন দেখে যে, গুরুজনদিগের প্রতি বালকবালিকাদের অভক্তি নাই—বালকবালিকাদিগের প্রতি গুরুজনদিগের অযত্ন নাই—সমবয়স্কদিগের প্রতি সমবয়স্কদিগের অনাদর নাই, তখন ঈশ্বরোপাসনার মাহাত্ম্য—ভাবে তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয়; আর, যখন দেখে যে গুরুজনদিগের প্রতি বালকবালিকাদিগের যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা, বালকবালিকাদিগের প্রতি গুরুজনদিগের যথোচিত যত্ন, সমবয়স্কদিগের প্রতি সমবয়স্কদিগের যথোচিত অনুরাগ, তখন ঈশ্বরোপাসনার মাহাত্ম্য ফলে তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। গৃহের সমস্ত পরিবারবর্গ একাত্মা হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলে এরূপ শুভ ফলের অভ্যুদয়ে বিলম্ব হইবে না, কেননা ঈশ্বরের প্রসাদ বারি সকল কল্যাণের প্রস্রবণ। সমস্ত শরীরে প্রাণের সঞ্চার হইলে তবেই তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বন্ধন দৃঢ় হয় এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে শরীরের অভ্যন্তরে প্রাণ আছে। তেমনি সমস্ত পরিবারবর্গ একাত্মা হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলে পরিবারবর্গের মধ্যে বন্ধনসূত্র দৃঢ় হয়—এবং পরিবারবর্গের মধ্যে বন্ধন সূত্র দৃঢ় দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বরোপাসনার প্রভাবে গৃহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা কার্য্য যথানিয়মে চলিতেছে। অতএব গার্হস্থ্য ঈশ্বরোপাসনায় আমাদের যেন অবহেলা না হয়—বিধিপূর্ব্বক যেন আমরা প্রত্যহই তাহাতে নিযুক্ত থাকি—কেননা ঈশ্বরের প্রসাদ সকল কল্যাণের মূল।

হে পরমাত্মন্! আমাদের সকলের উপরে তোমার অমৃতপ্রসাদ বারি সিঞ্চন কর। যাহাতে আমরা তোমাকে হৃদয়ে পাইয়া অক্ষুব্ধচিত্তে এবং অটল আনন্দে

স্থির করিয়া ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করত অস্ত্রতেজে তপোবন দগ্ধকরিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ রোষকষায়িতলোচনে যমদণ্ড সদৃশ ব্রহ্মদণ্ড উত্তোলিত করিলেন, বিশ্বামিত্রের যাবতীয় ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মবলে পরাভূত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন

"ধিক্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং।"
বালকাণ্ড, ৫৬ সর্গ ২৩ শ্লোক।

ক্ষত্রিয়বলে ধিক্, ব্রহ্মতেজোরূপ বলই যথার্থ বল। বশিষ্ঠদেব একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা আমার সমুদয় অস্ত্র বিফল করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়া ক্ষত্রিয় ভাব পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত তপস্যায় মনঃসমাধান করিব। এই বলিয়া তিনি মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া ফলমূলাহারী হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

সহস্র বৎসর অতীত হইলে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, কৌশিক! তুমি তপোবলে রাজর্ষিলোক অধিকার করিয়াছ, আমরা তোমাকে রাজর্ষি শব্দেই নির্দ্দেশ করিলাম। এই বলিয়া তিনি দেবগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র লজ্জায় অধোমুখ হইয়া দীনভাবে কহিলেন, হায়! আমি কত কঠোর তপস্যা করিলাম, কিন্তু দেবতা ও ঋষিগণ আমাকে রাজর্ষি ভিন্ন আর কিছুই করিলেন না। এক্ষণে বোধ হয় তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্ভবপর নহে। এরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনরায় তপস্যায় মনঃসমাধান করিলেন।

কয়েক সহস্রবৎসর অতীত হইয়া গেল। তাঁহার তপোবল ক্রমশই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার তপের তেজে বিশ্ব দগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। চারিদিক আকুল হইয়া উঠিল। সাগর সকল তরঙ্গসঙ্কুল, পর্ব্বত বিদীর্ণ ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল। বায়ু বিচ্ছিন্নভাবে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। প্রভাকরের প্রভা নির্ব্বাণ হইয়া আসিল। সেই অনলসকাশ মহর্ষিকে যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় দেখিয়া ব্রহ্মাদি মহর্ষিগণ তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,ব্রহ্মর্ষে! আমরা তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি অতঃপর ব্রাহ্মণ হইলে। এইরূপে বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের কাহিনী শেষ হইল। কত সাধনার অন্তে যে ব্রহ্মকে পাইয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, এবং পাশববল—ক্ষত্রিয়তেজের কত উপরে যে ধর্ম্মবল—ব্রহ্মতেজ প্রতিষ্ঠিত,পাঠকগণ তাহারও আভাস পাইলেন।

এইস্থানে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। বেদের রচনার সময় আরম্ভ করিয়া ক্রমে যখন আর্য্যজাতির ভিতরে সামাজিক উন্নতির উৎকর্ষ সাধিত হইল, আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসীগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত হইল, প্রত্যেক জাতির জন্য বিভিন্ন কার্য্য প্রণালী নিরূপিত হইল, সেই অনির্দ্দেশ্য কাল হইতে ব্রাহ্মণগণ স্বীয় জাতীয় চরিত্রের বলে ধর্ম্মনিষ্ঠার গুণে আর আর সকল জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের জ্বলন্ত ত্যাগস্বীকার দেখিয়া, সাংসারিক ভোগবিলাসে ঔদাসীন্য দেখিয়া, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চ্চার আধিক্য দেখিয়া ক্ষত্রতেজ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিল। ক্ষত্রিয়গণ যন্ত্রের ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত যন্ত্রী ব্রাহ্মণেরাই রহিলেন। এই

ভাবেই সমাজস্রোত বহমান হইয়া আসিতে লাগিল। যখন সামাজিক অবস্থা এইভাবে অক্ষুন্ন ছিল, রামায়ণ ও মহাভারত সেই সময়েরই রচনা। এই সময়েই জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যের মধ্যাহ্ন-রবি ভারতাকাশে পূর্ণ মহিমাতে বিরাজ করিতেছিল। চারি জাতির ভিতরে সৌহার্দ্দ বন্ধনের কিছুমাত্র অল্পতা হয় নাই। কোন জাতি অপর জাতির ন্যায্যস্বত্ব অধিকার ও বিলুপ্ত করিবার প্রয়াস পায় নাই। যদি বা ব্রাহ্মণেতর জাতির ভিতরে কেহ স্বীয় প্রতিভাবলে, সাধনার গুণে, স্বার্থত্যাগের প্রভাবে ব্রাহ্মণ পদবীতে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেন, ব্রাহ্মণগণের অনুকম্পা ও ঔদার্য্যবশতঃ তিনি সিদ্ধকাম হইতে পারিতেন; নতুবা নহে।

কালক্রমে যখন ব্রাহ্মণদিগের ভিতরে জাতিগত প্রাচীন সদ্‌গুণ সকলের ব্যত্যয় হইতে লাগিল, অথবা যে কারণেই হউক যখন ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য ক্ষত্রিয়দিগের অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন হইতে একটা বিদ্বেষের ভাব উভয়জাতির ভিতরে সংধুক্ষিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধবিপ্লব এই প্রধূমিত অগ্নির শেষ পরিণাম। পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন হইয়া আসিতেছিল, সময় পরিপক্ব হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া, বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণজাতির অনন্যসাধারণ অধিকার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন; কালপরম্পরাগত বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া—বেদকে অমান্য করিয়া—ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করিয়া—এক নূতন ধর্ম্মের সূত্রপাত করিলেন। সময়ের অনুকূলতায় অচিরকাল মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম দিক্‌বিদিক্ ছাইয়া ফেলিল।

যখন আমরা মূল রামায়ণের অন্তর্গত বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের তপোবন গমন, শবলা নামক কামধেনু লইয়া বশিষ্ঠের সহিত তুমুল সংগ্রাম, (ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে আশ্রমে গিয়া তপোরত মহর্ষির সহিত সংগ্রাম নিতান্ত অস্বাভাবিক) বশিষ্ঠের সম্বন্ধে তাঁহার প্রবল জাতক্রোধ, ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যান, ব্রহ্মতেজের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রসূত (ব্রাহ্মণ্য তেজের অনুকরণ-মূলক নহে বরং ঈর্ষামূলক) তাঁহার তপশ্চর্য্যার বিষয় পাঠ করি, তখন আমাদের মনে হয়, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ হইবার বিবরণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং মূলগ্রন্থে বৌদ্ধবিপ্লবের সময়ে সংযোজিত; অথবা বিশ্বামিত্র নামধারী অন্য কোন আধুনিক ঋষির জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অতিরঞ্জিত হইয়া এই বিশ্বামিত্রে আরোপিত ও রামায়ণে সংযোজিত।

অকিঞ্চনতা।

"সম্পদঃ পদমাপদাং"। সম্পদ নানা আপদের মূল। হিতোপদেশাদিগ্রন্থে এই উপদেশ বালকদিগকেও প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার অর্থ অতি গভীর।

আপদ দ্বিবিধ, দৈব ও মানুষ। দুর্ভিক্ষাদি ঘটনা দৈব আপদ; চৌর্য্যাদি ঘটনা মানুষ আপদ। সম্পদে উক্ত দৈবী ও মানুষী সমস্ত আপদ বর্ত্তে। তদতিরিক্ত আরো একপ্রকার আপদ আছে। তাহা মনুষ্যের প্রবৃত্তি পরিচালন দোষে সংঘটিত হয়। ক্রোধ লোভাদি রিপুজনিত আপদকে সেই শ্রেণীতে গণ্য করা যায়। এতন্মধ্যে চৌর্য্য দুর্ভিক্ষাদি আপদ নিবারণের জন্য রাজা ও জন সমাজস্থ লোকেরা পরস্পর চেষ্টা করিতে পারেন। শেষোক্ত আপদ প্রশমন করা

মনুষ্যের নিজের হস্তে। এ অপরাধ তাহার নিজ কৃত এবং সে নিজে তাহার ফল-ভাগী।

মনুষ্য ধন মান ঐশ্বর্য্যাদি সম্পদ লাভের নিমিত্ত নিতান্ত লালায়িত। সে তাহার জন্য দুঃসহ ক্লেশ রাশি সহ্য করে। এত করিয়া যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহার উপরে অবশ্যই অত্যন্ত মমতা আইসে। যখন দেখে যে তাদৃশ সম্পদ বহু ব্যক্তির নাই, তখন মনে অহঙ্কার জন্মে। সম্পদ-হেতু অহঙ্কারী ব্যক্তি যখন দেখে যে ধন দ্বারা সে বহু কার্য্য সাধন করিতেছে, শত শত লোক তাহার তোষামোদ করিতেছে, তখন তাহার অহঙ্কার অনিবার্য্য রূপে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। অহঙ্কারের সঙ্গে তাহার লোভ ক্রোধাদি রিপু অত্যন্ত প্রবল হয়। তখন তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ধৈর্য্য থাকে না। সে উন্মত্তের ন্যায় হয়। এরূপ লোকের প্রসাদও ভয়ঙ্কর।

ক্ষচিক্রুষ্টঃ ক্ষচিত্তুষ্টঃ রুষ্ট স্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥

এরূপ অব্যবস্থিত-চিত্ততা তাহার যেন স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, ক্রোধাহঙ্কারাদি-রিপু-পরতন্ত্র ধনবান ব্যক্তি, পৃথিবী প্রদান করিতে চাহিলেও লোকে তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় না।

ধনবান্ ক্রোধলোভাভ্যামাবিষ্টো নষ্টচেতনঃ।
তীর্য্যগীক্ষঃ শুষ্কমুখঃ পাপকো ভ্রূকুটীমুখঃ॥
নির্দ্দশন্নধরোষ্ঠঞ্চ ক্রুদ্ধো দারুণভাষিতা।
কস্তমিচ্ছেৎ পরিদ্রষ্টুং দাতুমিচ্ছতি চেন্মহীং॥
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৭৬ অঃ।

ধনবান ব্যক্তি ক্রোধ লোভের বশীভূত, নষ্টচেতন, বক্রদৃষ্টি, শুষ্কমুখ হইয়া ভ্রূকুটি ভঙ্গ ও অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া সক্রোধে দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করে। এরূপ ব্যক্তি পৃথিবী প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেও কেহ তাহার মুখ দেখিতে চায় না।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎপ্রণশ্যতি॥
গীতা।

ক্রোধ হইতে মোহ জন্মে, মোহ হেতু স্মৃতি নাশ হয়। স্মৃতি নাশ হইলে বুদ্ধিও বিনষ্ট হয়। বুদ্ধি নষ্ট হইলে মনুষ্যের সর্ব্ব প্রকারেই বিনাশ হইল।

কেবল ধন হেতু অহঙ্কার হয় এমন নহে। যৌবন, রূপ, মান, কুলমর্য্যাদা এ সকলও অহঙ্কারের কারণ।

অভিজাতোস্মি, শুদ্ধোস্মি, নাস্মি কেবল মানুষঃ।

এরূপ গর্ব্বপূর্ণ আস্ফালনে কত লোক আপনার অতি-মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করে। শাস্ত্রকারেরা একারণ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ের সূচনা করিয়াছেন।

অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে॥
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং ক্লেশকারিণং॥

ধন উপার্জ্জনে ও তাহার পরিরক্ষণে নানাবিধ ক্লেশ উপস্থিত হয়। ধন নাশে ধন ব্যয়েও দুঃখ জন্মে। অতএব এরূপ ক্লেশকর অর্থকে ধিক্।

ধনের সহিত বহু অনর্থের যোগ দেখাইয়া, শাস্ত্রকারেরা ত্যাগের প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া রাখিতে সর্ব্বদা উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা ত্যাগকে এক প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং শাস্ত্রে ত্যাগের বিধিও প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে রাজগণ যেমন অশ্বমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা আপনাদের মহিমা বিদ্যোতিত করিতেন, তেমনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া ত্যাগের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়। এই যজ্ঞের বিধান মতে সর্ব্বস্ব-

ত্যাগ করিয়া, পৃথিবীপতি রাজচক্রবর্ত্তী মহাত্মারাও অকিঞ্চন-ভাবে অবস্থান করিতেন। ত্যাগ-ধর্ম্মের নিদর্শন স্বরূপ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত।

কথিত আছে সূর্য্যবংশাবতংস পৃথ্বীশ্বর রঘু এ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিয়া একান্ত অকিঞ্চনতা প্রাপ্ত হইলে, গুরুদক্ষিণার্থী কৌৎস ঋষি ধন যাচ্ঞা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন মৃণ্ময় পাত্র ভিন্ন রাজার আর কোন বিভব ছিল না। অকিঞ্চন রঘুর সেই মৃৎপাত্রশেষা বিভূতির ফলেই রাঘব বংশের নাম চিরমহিমান্বিত হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ ভূরিদক্ষিণ-যজ্ঞে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ না করিলে, অথবা বৈখানস বৃত্তি অবলম্বন না করিলে, যে ত্যাগধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে না, এমন নহে। অনাসক্তিই ত্যাগের প্রধান ও মূলগত লক্ষণ। বিপুল সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়াও যে ত্যাগ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে, রাজর্ষি জনক তাহার উদাহরণ। বিদেহাধিপতি মহাত্মা জনক বলিয়াছিলেন

"অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।"

আমার ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই, কিন্তু এ সকল আমার কিছুই নহে; অতএব আমি অকিঞ্চন। সুতরাং

"মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন।"

সমস্ত মিথিলা নগরী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গেলেও আমার কিছু নষ্ট হয় না। ফলতঃ সকল ঐশ্বর্য্যের মূলে ত্যাগ-ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলে মনুষ্য সর্ব্বাংশে সুখী হয়, এবং ধনাদিরও যথোচিত সদ্ব্যবহার ও সার্থকতা হয়। সুবৃহৎ ভারত-গ্রন্থে সম্পদের দুঃখময় পরিণাম এবং ত্যাগ ধর্ম্মের নিত্য শান্তি, সহস্র উদাহরণ দ্বারা অতি উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

ধনমান-ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া কৌরবাদির বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। তাঁহারা আপনারাও উৎসন্ন হইলেন; এবং সমস্ত ভারতকে চিরদিনের মত অবনতির গভীর খাতে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

যাজ্ঞসেনীর প্রতি দুঃশাসনকৃত অপমান হেতু ভীমসেন রাক্ষস তুল্য রক্ত-পিপাসু হইয়াছিলেন। রাজ্য-লাভ জন্য জঘন্য হত্যা করিলে কি ঘোরতর মহাপাপ হয়, তাহা স্মরণ করিয়া কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণে গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের শরীর বিকম্পিত হইলেও এমনি সংসারচক্র—এমনি বিষয়-ব্যামোহ, যে তিনিও পরিশেষে স্বহস্তে কৌরব বংশের ও তাহার সঙ্গে অর্দ্ধ মনুজমণ্ডলীর বিনাশ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান হইল। পাণ্ডবদিগের বিজয়-বৈজয়ন্তী ভারতাকাশে উড্ডীন হইল। কিন্তু তাহাতে কি পাণ্ডবেরা সুখী হইতে পারিয়াছিলেন? যাহা লব্ধ হয় নাই, তাহা অমরাবতীর মকরন্দবিনিন্দিত অপূর্ব্ব মধুর পদার্থ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু লব্ধ হইলে আর তাহা তেমন সুখদায়ক থাকে না।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্যসুখ ভোগ করিলেন না; শোকে তাপে ঘৃণায় নির্ব্বেদে ও মর্ম্মপীড়নে আকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি হস্তিনায় তিষ্ঠিতে পারিলেন না। কৌরবদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধানের পরেই তিনি বিরাগী হইয়া গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার অন্তঃকরণের পীড়ার অপনয়ন হইল না। তিনি শান্তিলাভার্থ সবান্ধবে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন।

মহামতি ভীষ্ম নিজেই শরবিদ্ধ। কুরুক্ষেত্র শ্মশান-পূজার তিনিই প্রথম বলি। কিন্তু এখনও তাঁহার মহাপ্রাণ একবারে চলিয়া যায় নাই। যুধিষ্ঠির শোকাপনোদন জন্য সেই শরশয্যাশায়ী পিতামহের পদতলে আশ্রয় লইলেন। প্রজ্ঞাবান ভীষ্মদেব শোকসন্তপ্ত রাজাকে রাজধর্ম্মের এবং মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ দিলেন। তাঁহার উপদেশের সার এই, যে "সর্ব্বং ত্যক্ত্বা সুখীভব"। তুমি রাজ্যে ধনৈশ্বর্য্যে সুখ পাইবে না, এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া

সুখী হও; তুমি অকিঞ্চনতা অবলম্বন কর; ইহাতেই পরম মঙ্গল লাভ হইবে।

আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্।
অতিরিচ্যতে দারিদ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকং॥
আকিঞ্চন্যে চ রাজ্যে চ বিশেষঃ সুমহানয়ং।
নিত্যোদ্বিগ্নোহি ধনবান্ মৃত্যোরাস্যগতো যথা॥
নৈবাস্যাগ্নি র্ন চারিষ্টো ন মৃত্যু র্ন চ দস্যবঃ।
প্রভবন্তি ধনত্যাগাদ্বিমুক্তস্য নিরাশিষঃ॥
অকিঞ্চনঃ সুখং শেতে সমুত্তিষ্ঠতি চৈব হ।
আকিঞ্চন্যং সুখং লোকে পথ্যং শিবমনাময়ং॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৬ অধ্যায়।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

(শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য))

(আষাঢ় মাসের পত্রিকার পর।)

বদ্ধ হ'য়ে আশা পাশে কি দেখ স্বপন॥
মিছা কাযে কেন কেন করিছ ভ্রমণ॥
যে কায করিতে তুমি এসেছ এ ভবে।
সে কায ভুলিলে—অন্তে কিবা দশা হবে?
যে কিছু তোমার ধন ক্ষমতা সময়।
গচ্ছিত তোমার কাছে জেন সমুদয়॥
"কড়ার কড়া" করিতেছ যাহা অপব্যয়।
তার লাগি পরিতাপ হইবে নিশ্চয়॥

কেন আর পাপ-সর্প হৃদয়ে পুষিবে?
বিষের জ্বালায় আর কতই দহিবে?
যিনি শান্তি-রসায়ন, শুনি তাঁর আবাহন,
তাঁহার অমৃত পথে তবু না চলিবে?

অসাড় আত্মাতে করি অমৃত সিঞ্চন।
দিতেছেন তারে যিনি নূতন জীবন॥
তিনি সবাকার সনে, থাকি হৃদি সঙ্গোপনে,
আত্মার মঙ্গল তরে বলেন বচন॥

কেমনে হইবে তুমি একান্ত তাঁহার।
এই জন্য দয়াময় ব্যস্ত অনিবার॥
কবে মোহ পাশরিবে, মিছা কায তেয়াগিবে,
করিবে তাঁহার কার্য্য জীবনের সার॥

মহা পাপী যেই হয় পাষাণ হৃদয়।
তারেও করেন দয়া প্রভু দয়াময়॥
অনুতাপ বারি দিয়া, শোধেন তাহার হিয়া,
ইহ কিম্বা পরে দেন তারে পদাশ্রয়॥

এস সবে পাপ মলা করিয়া খালন।
পাপ জন্য অনুতাপি করিয়া ক্রন্দন॥
প্রতিদিন প্রাতে করি তাঁর উপাসনা।
ভক্তি ভরে তাঁর কাছে করিগে প্রার্থনা॥
"অদ্যকার দিনে নাথ! থাক মোর সনে।
রাখি যেন হৃদি তোমা নয়নে নয়নে॥
সংসারের কার্য্য কিবা জ্ঞান উপার্জ্জন।
তব নাম সুধা দিশি দিশি বিতরণ॥
তোমার আদেশ যাহা বলহ আমায়॥
পালন করিতে পারি হও হে সহায়॥"
কর তাঁর উপাসনা, তাঁর নাম গান।
সঁপি দাও তাঁরে তুমি দেহ মনঃপ্রাণ॥
যে প্রীতি বর্ষেণ তিনি সবার উপরে।
কণা তাঁর ধর তুমি সর্ব্ব জীব তরে॥
"আপনার" আপনার না রাখিও আর।
সবারে সমান চখে দেখ একবার॥
যত দূর পার কর পর উপকার।
কারো প্রতি কভু নাহি করো অত্যাচার॥
ভাই বন্ধু সবে যাহে হয় ব্রহ্মবান্।
দেবভাবে যাহে সবে হয় গরীয়ান্।
হেন বাক্য তাহাদের সদা তুমি কও।
দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুমি তাহাদের হও॥
প্রতি দিন তাঁর কাছে হও অগ্রসর।
দিন দিন দাও তাঁরে অন্তর-অন্তর॥

অদ্যকার দিন শেষ দিন ভাবি চিতে।
থাকহ প্রস্তুত জীব! পৃথিবী ত্যজিতে॥
অদ্য প্রীতমনে তাঁরে করিয়া স্মরণ।
তাঁর সেবা প্রিয়কার্য্য কর সমাপন॥
অদ্য যদি আসে মৃত্যু তোমার নিকটে।
বলিতে পারিবে তারে তুমি অকপটে॥
"প্রস্তুত আছি হে মৃত্যু! আমি তোমা তরে।
যাইব তোমার সনে নির্ভয় অন্তরে॥
প্রতি পল যাঁর দয়া পেয়েছি জীবনে!
আনন্দে উৎফুল্ল হিয়া যাঁহার স্মরণে॥
তাঁর চর হয়ে তুমি এসেছ এখানে।
আমাকে লইয়া যাবে তাঁর সন্নিধানে॥
কি আনন্দ! যাব আজি পিতার ভবন!
যেখানে নাহিক জরা বিলাপ মরণ॥
পৃথিবীর মলিনতা যা আছে আমার।
পিতার প্রসাদে তথা থাকিবেনা আর॥
যথা প্রেম শুদ্ধ প্রেমে ভরিবে হৃদয়।
নূতন জীবন পাব কিবা সুধাময়!
বিভুর মহিমা যথা কতই দেখিব॥

দেখিয়া তাঁহার প্রেম ভক্তিতে গলিব।
মর্ত্ত্যেতে করেন তিনি যে কিছু বিধান।
দেখিতে পাইব তাহে কেবলি কল্যাণ॥
দেখিব তাঁহার প্রেম—গম্ভীর অপার।
সে প্রেমের কণা বুঝে হেন সাধ্য কার॥
যথা দেব সাধু সহ মিলিত হইয়া।
গাছিব পিতার গুণ পরাণ ভরিয়া॥
যথা প্রেম যোগানন্দে কেবলি মজিব।
পিতার মঙ্গল কায নিয়ত সাধিব॥"

প্রার্থনা।

হে নাথ! লইনু মোরা তব পদাশ্রয়।
জীবন মরণে দাও তোমার অভয়॥
তব বলে কর বলী তুমি যেই জনে।
কি ভয় তাহার দুঃখ মৃত্যু আগমনে॥
সুখ দুঃখ জানে যেই তোমার বিধান।
তাহার নিকটে মৃত্যু অমৃত সোপান॥

ইতি দ্বিতীয় প্রকরণের—তৃতীয় ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৫৫৩৸৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১৩২৸৶৮
সমষ্টি	৩৬৮৬৸/২
ব্যয় ...	৪৮৭৸/১১
স্থিত	৩১৯৮৸৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১২১৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১২০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	১৲
	১২১৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫৩৷/৬

শ্রীযুক্ত রাজা জি, এন্ গজপতিরাও বাহাদুর	ভিজাগাপর্ত্তন	১০৶০
„ বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	কেশবপুর	/৬
„ „ রসিকলাল রায় মুন্সী	দার্জ্জিলিং	৫৲
„ „ কীর্ত্তিরাম বড়ুয়া,	শিলং	৩৷৶০
„ „ পতিতপাবন মিত্র,	খিদিরপুর	৭৲
„ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ,	মেদিনীপুর	৩৷৶০
„ „ ব্রাহ্মসমাজ,	কুচবেহার	৫৲
„ বাবু যোগেন্দ্রনাথ দাস,	কলিকাতা	৩৲
„ „ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী,	ঐ	১৲
„ „ হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	২৲
„ „ বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	৩৲
„ „ হরিমোহন নন্দী,	ঐ	২৷০
„ রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর	ঐ	৩৲
„ মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর	ঐ	৩৲
৺ জয়গোপাল সেন	ঐ	১৲
„ „ বৈকুণ্ঠনাথ সেন,	ঐ	১৲
„ „ নবীনচন্দ্র ঘোষ,	ঐ	১৲
এক সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয়		৷৶০
		৫৩৷/৬
পুস্তকালয়		৫৷৶৬
যন্ত্রালয়		৩০০৸/৬
গচ্ছিত		১/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২৲
সমষ্টি		৫৫৩৸৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৮৪৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩১/৯
পুস্তকালয় ...	৩২৸৯
যন্ত্রালয় ...	২৩৯৸/৫
সমষ্টি	৪৮৭৸/১১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০এ কার্ত্তিক শুক্রবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭টার সময়ে ঈশ্বরোপাসনা হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
প্রথম ভাগ।
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৬।

৬০৮ সংখ্যা   ১৮১৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে
গার্হস্থ্য উপাসনার সময়

আচার্য্যের উপদেশ।

৪ঠা কার্ত্তিক। রবিবার।

পরমাত্মা স্বয়ং সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ এবং তিনি তাঁহার জ্ঞান এবং সত্য সর্ব্ব জগতে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যে কেহই বাধা দিতে পারে না—কেননা তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার কার্য্য অব্যভিচারী নিয়মে নিয়মিত হইতেছে—কেননা তিনি ন্যায়বান্ বিশ্ব-বিধাতা। তাঁহার জ্ঞান এবং সত্য আমাদিগকে মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে—তাই আমাদের চক্ষু ফুটিতেছে—তাই আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞানে উপলব্ধি করিতেছি যে, তিনি আমাদের পরম পিতা পরমমাতা পরমসুহৃৎ—তিনি আমাদের সকল মঙ্গলের মূলাধার। আমরা দেখিতেছি যে, তাঁহারই আদেশে, সমস্ত প্রকৃতি মনুষ্যকে জ্ঞানে ধর্ম্মে সত্যে মঙ্গলে বিভূষিত করিয়া উন্নতির শিখরে আরোহণ করাইবার জন্য নিরন্তর উদ্যত রহিয়াছে। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র অভ্রান্ত নিয়মে নিয়মিত হইয়া মনুষ্যকে জ্যোতিষের জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে। অগ্নি এবং জল স্থূল বস্তু সকলকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে পরিণত করিয়া মনুষ্যকে রসায়নের জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে। জীব জন্তু এবং উদ্ভিদ্ নানা জাতিতে এবং নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া মনুষ্যকে প্রাণীতত্ত্বের জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে।

চেতনাচেতন সকল বস্তুর অভ্যন্তরেই জ্ঞানের নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্য করিতেছে, তাই বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা সকল বস্তুর মধ্য হইতেই নিগূঢ় তত্ত্ব উপার্জ্জন করিয়া আপন আপন জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়তই পূরণ করিতেছেন—অথচ কোনো একটি তত্ত্বের কণাংশেরও অন্ত করিতে পারিতেছেন না। এরূপ হইতেছে সে কেবল সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ; নহিলে অজ্ঞান প্রকৃতির নিজের কি সাধ্য যে, সে জ্ঞানবান্ মনুষ্যকে জ্ঞানশিক্ষা দেয়। নির্ধন ব্যক্তি কি ধন বিতরণ করিতে পারে? অতএব সমস্ত প্রকৃতির মূলে সর্ব্বশক্তিমান্

সর্ব্বনিয়ন্তা করুণার সাগর প্রেমের আকর এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাই

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ বায়ু মৃত্যু সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে;—তাই অজ্ঞান প্রকৃতিও জ্ঞানবান্ মনুষ্যকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে—নিয়ম শিক্ষা দিতেছে। চক্ষে যখন আমরা দেখি যে চিকিৎসক বহুযত্নে রোগীর রোগ আরোগ্য করিতেছেন—মাতা কেবল শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আছেন; জ্ঞানে তখন আমরা ধ্রুব উপলব্ধি করি যে মাতা না থাকিলে কে চিকিৎসককে ডাকাইয়া আনিত? চক্ষে যখন দেখি যে, শিক্ষক বহু কষ্টে বালককে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেছেন—পিতা কেবল মাঝে মাঝে এক এক বার শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেছেন, জ্ঞানে তখন আমরা ধ্রুব উপলব্ধি করি যে, পিতা না থাকিলে কে শিক্ষক নিযুক্ত করিত? তেমনি যখন আমরা দেখি যে, সূর্য্য চন্দ্র যথানিয়মে উদয়াস্ত হইতেছে—ঋতুচক্র ঘুরিতেছে— পিতা মাতা পুত্র কন্যাগণকে স্নেহ করিতেছেন, পুত্র কন্যা পিতা মাতাকে ভক্তি করিতেছে, গুরু শিষ্যকে জ্ঞান দান করিতেছেন, শিষ্য কৃতজ্ঞতার সহিত গুরুর উপদেশ মান্য করিতেছে—সমবয়স্কেরা সমবয়স্কদিগের সহিত বন্ধুতা করিতেছে—তখন আমরা জ্ঞানে ধ্রুব উপলব্ধি করি যে, এই যে সকল প্রভূত মঙ্গলের ব্যাপার ইহার কিছুই থাকিত না, যদি মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা মূলে অধিষ্ঠান না করিতেন—তিনিই সকল মঙ্গলের মূল। অতএব মোহ-কোলাহল দূরে বিসর্জ্জন করিয়া ক্ষণকালের জন্য পরমাত্মার স্নেহপূর্ণ করুণাপূর্ণ আহ্বানধ্বনির প্রতি মনোনিবেশ কর—তিনি বলিতেছেন উত্থান কর জাগ্রত হও সত্যের পথে জ্ঞানের পথে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হও। মাতা পিতা এবং হিতৈষী বন্ধুর আহ্বানে যদি কোনো আকর্ষণ থাকে তবে—পরমপিতা পরমমাতা এবং পরম হিতৈষী বন্ধুর আহ্বানে মঙ্গল-ইচ্ছার আকর্ষণ কত না প্রবল—আমরা মোহ-কোলাহলে বিভ্রান্ত হইয়া সে আহ্বান-ধ্বনির প্রতি মনোনিবেশ করি না—তাই আমরা তাহার আকর্ষণ অনুভব করি না—অনুভব করিলে আমরা কখনই তাহা এড়াইতে পারিতাম না। তাহা হইলে আমরা আর কোনো কথা না শুনিয়া, আর কোনো দিকে দৃষ্টি না করিয়া, পরম দেবতা পরমাত্মার মঙ্গল ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইতাম। তখন আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিতাম—

সহজে ধায় নদী সিন্ধুপানে, কুসুম করে গন্ধ দান,
মন সহজে সদা চায় তোমারে তোমাতেই অনুরাগী—

কিন্তু এখন আমরা অগত্যা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।

হে পরমাত্মন্! তোমার অভিপ্রেত মঙ্গল পথে চলিতে যাহাতে আমাদের উদ্যম ভঙ্গ না হয়—ইচ্ছা অবসন্ন না হয়—আমাদিগের প্রতি সেইরূপ প্রসাদ বিতরণ কর। আমাদের ইচ্ছা সত্তেও দুর্ব্বলতা যদি আমাদিগকে আক্রমণ করে তখন যেন আমরা তোমার সর্ব্বলোকপালনী শক্তি দেখিতে পাই, তাহা দেখিবা মাত্র আমাদের দুর্ব্বল শরীরে বল পৌঁছিবে—নির্জীব হৃদয় সজীব হইবে। এই ভয়াবহ সংসারে তুমিই আমাদের একমাত্র অভয়ের সেতু—তুমিই আমাদের পিতা মাতা সুহৃৎ।

১১ই কার্ত্তিক। রবিবার।

গৃহস্থ পরিবারবর্গের প্রত্যেকের মঙ্গল এবং সমস্ত গৃহের মঙ্গল দুই নহে কিন্তু একই। সকল মঙ্গলেরই সহিত সকল মঙ্গল ঘনিষ্ঠ যোগ-সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। এমন কি দেশের মঙ্গলের উপর গৃহের মঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যদি দেশে বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকে, তবে বালকেরা বিশুদ্ধরূপে শিক্ষিত হইতে পারে না। যদি দেশে কুরীতি প্রচলিত থাকে, তবে যুবকেরা সংসারের প্রথম সোপানে পদনিক্ষেপ করিতে না করিতেই কুসংসর্গের বিষাক্ত বায়ুতে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। দেশের মঙ্গলের সঙ্গে গৃহের মঙ্গলের যখন এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তখন এক গৃহের পরিবারবর্গের একজনের মঙ্গলের সহিত আর একজনের মঙ্গলের যে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না ইহা হইতেই পারে না। গৃহের পরিবারবর্গের সকলের প্রকৃতি সমান নহে বলিয়া যে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবের বন্ধন থাকিবে না তাহারও কোনো অর্থ নাই। চক্ষুর প্রকৃতি একরূপ, হস্তপদের প্রকৃতি আর একরূপ; চক্ষু জ্ঞানেন্দ্রিয় হস্তপদ কর্ম্মেন্দ্রিয়; অথচ আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা যখন কণ্টকবনের মধ্য দিয়া চলি, তখন চক্ষু হস্তপদকে কণ্টকের আক্রমণ হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করে; আবার যখন আমরা সূর্য্যের প্রত্যভিমুখে চলি, তখন হস্ত আপনা হইতেই ললাটে উত্থান করিয়া চক্ষুকে সূর্য্যকিরণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। অতএব এক গৃহের পরিবার-বর্গের মধ্যে যদি সদ্ভাবের বন্ধন শিথিল হয় তবে তাহার কারণ প্রকৃতি-বৈচিত্র নহে—তাহার কারণ ভ্রম প্রমাদ মোহ। জ্ঞান যেমন সত্য এবং মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ করে—মোহ তেমনি আপনার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে। দৃষ্টিসংকোচ হইতে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়—অবিশ্বাস হইতে অসদ্ভাব উৎপন্ন হয়, অসদ্ভাব হইতে অসদ্ব্যবহার উৎপন্ন হয়। আমার দৃষ্টি যদি আমাতেই বদ্ধ থাকে, তবে ক্রমে আমার মনে এইরূপ সংস্কার জন্মে যে, অন্যের দৃষ্টিও কেবল তাহার আপনাতেই বদ্ধ; এই অমূলক সংস্কার হইতে বিনা কারণে অন্যের প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়। অবিশ্বাস হইতে অসদ্ভাব উৎপন্ন হয় এবং অসদ্ভাব হইতে অসদ্ ব্যবহার উৎপন্ন হয়। তখন আমার ভাব এবং ব্যবহার দেখিয়া, অন্যেরাও আমার প্রতি বিরূপ হয়; তাহা দেখিয়া আমার অসদ্ভাব আরো উত্তেজিত হয়—আমি মনে করি যে, সকলেই যে আমার শত্রু এতদিন পরে তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইলাম। এইরূপ মোহ হইতে দৃষ্টি সংকোচ, দৃষ্টি সংকোচ হইতে অবিশ্বাস, অবিশ্বাস হইতে অসদ্ভাব, অসদ্ভাব হইতে অসদ্ব্যবহার, একে একে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশ বর্দ্ধিত হয় এবং যতই বর্দ্ধিত হয় ততই চতুর্দিকে কণ্টকাকীর্ণ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে থাকে।

এই সকল গার্হস্থ্য অমঙ্গলের এক মাত্র ঔষধ ঈশ্বরের উপাসনা। ঈশ্বরোপাসনার প্রসাদেই আমাদের দৃষ্টি আপনাতে সঙ্কুচিত না হইয়া সত্য এবং মঙ্গলের প্রতি প্রসারিত হয়। এবং সেই সঙ্গে পরিবারবর্গের প্রতি বন্ধুবর্গের প্রতি এবং লোকের প্রতি আমাদের হৃদয়ের সদ্ভাব প্রসারিত হয়। ঈশ্বরের উপাসক প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরের সমক্ষে এইরূপ সংকল্প করেন—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব মাঙ্গল্য বিষ্ণো ভব

দাজ্ঞৈব হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রা-মনুবর্ত্তয়িষ্যে।

হে লোকেশ চৈতন্যময় অধিদেব—হে মঙ্গলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা—তোমার আজ্ঞায় লোকের হিতের জন্য এবং তোমার প্রীতিলাভ করিবার জন্য সংসার-যাত্রার অনুবর্ত্তী হইতেছি।

হে পরমাত্মন্! তুমিই সকল মঙ্গলের মূল—তুমি আমাদের সকলকে তোমার মঙ্গল-ছায়ার আশ্রয় প্রদান কর। তোমার অমৃত প্রসাদ-বারিতে আমাদের শরীর মন আত্মা পবিত্র হইবে এই আশাতে আমরা তোমার কৃপাদৃষ্টি প্রতীক্ষা করিতেছি তুমি আমাদের প্রার্থনা পূরণ কর।

১৮ই কার্ত্তিক। রবিবার।

কলম্বস্ যখন তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইলেন যে, আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের পর-পার আছে, তখন অনেকেই তাঁহার কথা বাতুলের প্রলাপের ন্যায় অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলেন—কেবল দুই এক ব্যক্তি যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে যাইবেন তাঁহাদের মনে বিশ্বাস হইল যে তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু তাহা যে কত সত্য তাহা তাঁহারাও তখন বুঝিতে পারেন নাই। সমুদ্রপথে যাত্রারম্ভ করিয়া অবধি প্রতিদিনই যখন তাঁহারা একই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন—প্রতিদিনই যখন তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন যে জাহাজ প্রাণপণ বেগে অগ্রসর হইতেছে অথচ তাঁহারা দিক্-চক্রবাল-পরিবেষ্টিত সমুদ্রের মধ্যস্থলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন—কোনো কালে যে কূল দেখিতে পাইবেন তাহার কোনো আশা নাই; তখন তাঁহাদের পূর্ব্বের সে সরল বিশ্বাস মন হইতে অন্তর্ধান করিল—তখন তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। আবার, দুই দিন পরেই তাঁহারা যখন দেখিলেন—চিরাভিলষিত কূল সম্মুখে প্রত্যক্ষ বিরাজমান, তখন তাঁহারা বুঝিলেন—কলম্বসের কথা কত সত্য। কলম্বস যেমন আমেরিকার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মধর্ম্ম তেমনি আমাদিগকে সত্য এবং মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহারা সত্যও বোঝেন না, মঙ্গলও বোঝেন না, কেবল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই বোঝেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অমূল্য হিতবাক্য সকলকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেন। অপর ব্যক্তিরা তাহা সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করেন, কিন্তু তাহা যে কত সত্য তাহা তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে জানেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন

'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ।

পরবশ যাহা কিছু সমস্তই দুঃখ, আত্মবশ যাহা কিছু সমস্তই সুখ, সংক্ষেপে সুখ দুঃখের এইরূপ লক্ষণ জানিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বচনটি নিতান্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মনঃপূত হইতে পারে না; তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরা ঐ বচনটি সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করেন কিন্তু উহা যে কত সত্য তাহা তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এখনো পর্য্যন্ত জানেন না; তাহা যদি তাঁহারা জানিতেন তবে পরাধীনতার রাজ্যে সুখের অন্বেষণ করিতেন না। ধর্ম্মপথের কোনো কলম্বস্ যদি বলেন যে, প্রবৃত্তি-স্রোতের প্রতিকূলে গমন করিলে দুঃখের পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়—আমার সঙ্গে কে যাইবে আইস, তবে অতি অল্প লোকেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবে। যাঁহারা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার অনু-

গামী হইবেন তাঁহারা মধ্য-গঙ্গায় উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই সংশয়-তরঙ্গে দোলায়মান হইবেন; মধ্য-গঙ্গায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন চতুর্দ্দিকে দেখিবেন যে, কূলের কোথাও কোনো চিহ্ন নাই, তখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাপুরুষের ন্যায় ভয়ে বিহ্বল হইয়া জলে ঝাঁপ দিলেও দিতে পারেন; অবশিষ্ট যাত্রীরা যথা-সময়ে দুঃখের পরপারে সেই আনন্দের নিজ নিকেতনে উত্তীর্ণ হইবেন যেখানে শান্তির মুক্ত সমীরণ কোনো প্রাচীরের অবরোধ জানে না। কিন্তু সাবধান! আসল জিনিস মাত্রেরই নকল আছে। আসল জিনিসের মর্য্যাদা বুঝিতে হইলে মার্জ্জিত জ্ঞান এবং মার্জ্জিত রুচি আবশ্যক, এই জন্য অনেকে তাহা বুঝিতে পারেন না; যাঁহারা তাহা বোঝেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে তাহার মূল্য দেখিয়া ভীত হ'ন। নকল জিনিস্ ঠিক্ ইহার বিপরীত; তাহা আসল জিনিস্ অপেক্ষা দেখিতে সুরঞ্জিত অথচ তাহার মূল্য যৎসামান্য। এই জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে অনেকে তাহা জানেন না; যাঁহারা জানেন, তাঁহারা তাহার উপার্জ্জনের পথ দুর্গম দেখিয়া ভয়ে সে দিকে অগ্রসর হ'ন না। কৃত্রিম স্বাধীনতা ঠিক্ তাহার বিপরীত—তাহা দেখিতে যেমন আপাত-রমণীয় তাহার উপার্জ্জনের পথও তেমনি সুগম। আমাদের দেশের নব্য শিক্ষা কৃত্রিম স্বাধীনতার তাই এত পক্ষপাতী। সে শিক্ষার মূল কথা দুইটি—আপনার ইচ্ছানুসারে চলা'র নাম স্বাধীনতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কথা শোনা'র নাম পরাধীনতা। ব্রাহ্মধর্ম্ম পরাধীনতা এবং স্বাধীনতা উভয়েরই প্রকৃত লক্ষণ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এই:—

যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥

যে ব্যক্তি জ্ঞান-শূন্য এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত তাহার ইন্দ্রিয়-সকল সারথীর দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না। ইহাই পরাধীনতার প্রকৃত লক্ষণ। আর,

যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ।

যিনি জ্ঞানবান্ এবং সংযতচিত্ত তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সারথীর সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় বশীভূত। ইহাই স্বাধীনতার প্রকৃত লক্ষণ।

অতএব যদি স্বাধীন হইতে চাও তবে প্রবৃত্তি সমূহকে জ্ঞানের অধীনে পরিচালনা করিতে শিক্ষা কর। প্রথম প্রথম আমাদের জ্ঞান প্রবৃত্তির সহিত এরূপ জড়িত থাকে যে, অনেক সময় আমরা প্রবৃত্তির কথাকেই জ্ঞানের কথা মনে করি; অনেক সময় এরূপ হয় যে, আমরা প্রবৃত্তির কথা শুনিয়া চলিতেছি অথচ মনে করিতেছি যে, আমরা জ্ঞানের কথা শুনিয়া চলিতেছি। এই অবস্থায় শুভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানবান্ সদ্গুরুর উপদেশ নিতান্তই প্রার্থনীয়। শুভাকাঙ্ক্ষী সদ্গুরু উপর হইতে আমাদের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি করেন;—তিনি যেখানে দাঁড়াইয়া আছেন, সেখানে আমাদের দুর্দান্ত প্রবৃত্তি-সকলের কোলাহল পৌঁছিতে পারে না;—কেবল আমাদের অন্তরের জ্ঞান কি বলিতেছে তাহাই তিনি উপদেশ-চ্ছলে আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত করেন। ছিদ্রান্বেষী কপট বন্ধুদিগের আচার ব্যবহার ঠিক্ ইহার বিপরীত; আমাদের জ্ঞান কি বলে কি না বলে তাহার জন্য ইহাঁদের কোন ভাবনা চিন্তা নাই; আমাদের প্রবৃত্তি কি বলে তাহাই কেবল ইহাঁরা দেখেন এবং তাহাই নানা

কলে কৌশলে আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত করেন। হিতান্বেষী জ্ঞানবান্ সদ্‌গুরুর কথা শুনিয়া চলিলে আপনারই অন্তরস্থিত জ্ঞানের কথা শুনিয়া চলা হয়, এবং জ্ঞানের কথা শুনিয়া চলিলে স্বাধীনতার পথ অবলম্বন করা হয়। মূঢ় অথবা দুষ্ট লোকের কথা শুনিয়া চলিলে আপনার প্রবৃত্তির কথা শুনিয়া চলা হয় এবং প্রবৃত্তির কথা শুনিয়া চলিলে পরাধীনতার পথ অবলম্বন করা হয়—পরাধীনতার পথ অবলম্বন করিলে

দৌর্ভিক্ষ্যাৎ যাস্তি দৌর্ভিক্ষ্যং
ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াৎ ভয়ং।

দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে ক্লেশ হইতে ক্লেশে ভয় হইতে ভয়ে উত্তীর্ণ হইতে হয়। আমাদের জ্ঞান আমাদের অন্তরের বস্তু, তাহা আমাদের আপনার বস্তু; জ্ঞানের অধীনে চলা আর আপনার অধীনে চলা একই কথা। কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তি সকল যতক্ষণ ইতস্ততঃ জ্ঞানের প্রতিকূলে বহির্বস্তু দ্বারা পরিচালিত হয় ততক্ষণ তাহারাও বাহিরের বস্তু—ততক্ষণ তাহারা পর; তাই প্রবৃত্তির অধীনে চলার নামই পরাধীনতা। অতএব যদি স্বাধীনতা চাও তবে আপনার জ্ঞানের কথা শুনিয়া চল। যদি আপনার জ্ঞানের কথা শুনিতে চাও তবে শুভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানবান্ সদ্‌গুরুর নিকট গমন কর। ইহাই স্বাধীনতা লাভের প্রথম সোপান। এই প্রথম সোপান হইতে যাত্রারম্ভ করিলে আমরা যথা সময়ে চরম সোপানে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। হৃদয়ের অভ্যন্তরে যেখানে প্রবৃত্তি সমূহ এবং স্বার্থ আধিপত্য করিতেছে, সেইখানে ঈশ্বরপ্রীতিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা স্বাধীনতা-লাভের চরম সোপান। বিশুদ্ধ প্রীতির বিকাশ হইলে সেই সঙ্গে গুরূপদিষ্ট জ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরিস্ফুটতা লাভ করে। এইরূপে সুপরিস্ফুট জ্ঞান এবং প্রীতির যুগপৎ সাহায্যে সাধকের ইচ্ছা পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের ইচ্ছার সহিত একীভূত হইয়া যায়। আত্মার এইরূপ অবস্থাই স্বাধীনতার পরিপক্ক অবস্থা ইহারই নাম মুক্তি। ব্রাহ্মধর্ম্মে কথিত হইয়াছে—

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান নরঃ
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।

বিজ্ঞান যাহার সারথী এবং মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি পরব্রহ্মের পরম পদ প্রাপ্ত হ'ন। ইহাই স্বাধীনতার চরম পরিণাম।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে মাতার ন্যায় স্নেহ করিতেছ, পিতার ন্যায় পালন করিতেছ, গুরুর ন্যায় জ্ঞান দান করিতেছ। তাই তোমার প্রতি আমার নয়ন উত্তোলন করিতেছি। বিষয়াসক্তির কুটিল বন্ধন সকল মোচন করিয়া তোমার প্রেমসুধা বর্ষণে আমাদের শূন্য হৃদয় পূর্ণ কর—মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার কর—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

২৫শে কার্ত্তিক। রবিবার।

পর্ব্বতের শিখর হইতে দৃষ্টিপাত করিলে নিম্নস্থিত বিস্তীর্ণ প্রদেশের কোথায় নগর, কোথায় গ্রাম, কোথায় প্রান্তর, কোথায় বন, কোথায় নদী সমস্তই নখদর্পণের ন্যায় সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; তেমনি জ্ঞানের উচ্চ শিখর হইতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা জগতের সন্ধিভাগ সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, এবং সেই সঙ্গে দেখিতে পাই যে এক পরমাশ্চর্য্য সত্য এবং মঙ্গলের সোপান-রাজি নিম্নতম ভৌতিক বস্তু হইতে উচ্চতম জ্ঞানের শিখর

পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে সমুত্থান করিয়াছে। সমস্তের মধ্য হইতেই এই মহা নিনাদ ধ্বনিত হইতেছে যে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং—সকলে মিলিয়া একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে যে, পরমাত্মা অনন্ত-জ্ঞানের সমুদ্র—অমৃত আনন্দের আকর, শান্তি এবং মঙ্গলের আলয়, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। আমরা দেখিতে পাই যে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বি-ভক্ত—অচেতন পদার্থ এবং সচেতন পদার্থ; অচেতন পদার্থ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রাণ-শূন্য জড় এবং প্রাণভৃৎ উদ্ভিদ্; সচেতন পদার্থ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—মূঢ় জীব এবং জ্ঞানবান্ মনুষ্য; সর্ব্বশুদ্ধ জগৎ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—অচেতন জড় পদার্থ, অচেতন প্রাণভৃৎ পদার্থ, সচেতন মূঢ় জীব এবং জ্ঞানবান মনুষ্য। এই শ্রেণী-বিভাগের মধ্য দিয়া উন্নতির সোপানরাজি কোথা হইতে কোথায় চলিয়াছে তাহাও আমরা দেখিতে পাই। দেখিতে পাই যে, সে সোপান-রাজি অচেতন বস্তু হইতে উদ্ভিদে উঠিয়াছে—উদ্ভিদ্ হইতে জীবে উঠিয়াছে—জীবজন্তু হইতে মনুষ্যে উঠি-য়াছে;—মনুষ্যে উঠিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই; মনুষ্যের মূঢ় প্রকৃতি হইতে জ্ঞান ধর্ম্মের উচ্চ শিখরে উঠিয়াছে। কেননা পৃথিবীর মধ্যে যেমন মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যের মধ্যে তেমনি জ্ঞানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যের আত্মা সেই জ্ঞানধর্ম্মের শিখর প্রদেশ। আত্মা-তেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। জীব জন্তুদিগের গ্রীবা অবনত; তাহাদের দৃষ্টি পৃথিবী-তেই বাঁধা। মনুষ্যের গ্রীবা সমুন্নত—মনুষ্যের অন্তর্দৃষ্টি অনন্ত আকাশ ছাড়া-ইয়া প্রসারিত হয়। 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ' মনুষ্য পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। মনুষ্যের আত্মাকে কে তবে পূর্ণ করিবে? সূর্য্যালোক মনু-ষ্যের চক্ষুরিন্দ্রিয় পূর্ণ করে, গীতমাধুর্য্য মনুষ্যের শ্রবণেন্দ্রিয় পূর্ণ করে, স্নিগ্ধ সমীরণ মনুষ্যের ত্বগিন্দ্রিয় পূর্ণ করে, বন কাননের কুসুম সৌরভ মনুষ্যের ঘ্রাণেন্দ্রিয় পূর্ণ করে, সুস্বাদু ফল মনুষ্যের রসনেন্দ্রিয় পূর্ণ করে, অন্নজল মনুষ্যের ক্ষুৎপিপাসা পূর্ণ করে, স্ত্রী পুত্র বন্ধুবান্ধব মনুষ্যের সঙ্গলিপ্সা পূর্ণ করে, সাধুসঙ্গ মনুষ্যের উন্নতি-স্পৃহা পূর্ণ করে; কিন্তু মনুষ্যের আত্মাকে ইহাদের কেহই পূর্ণ করিতে পারে না। মনু-ষ্যের আত্মাকে পরমাত্মা স্বয়ং পূর্ণ ক-রেন। অন্নপান দ্বারা যেমন শরীর পরি-তৃপ্ত হয়, সৎসঙ্গ দ্বারা যেমন আমাদের মন পরিতৃপ্ত হয়, পরমাত্মার আরাধনা দ্বারা তেমনি আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন

'শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্ম-ন্যেবাত্মানং পশ্যতি।'

সাধক শান্ত দান্ত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন। সং-সারক্ষেত্রে সর্ব্বদাই মনুষ্য আপনার আত্মা দিয়া অন্যের আত্মাকে দর্শন করে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন যে, সাধক শান্ত দান্ত হইয়া অর্থাৎ মনকে প্রবৃত্তি এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব কোলাহল হইতে উচ্চে উঠাইয়া, তিতিক্ষু হইয়া অর্থাৎ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া, সমাহিত হইয়া অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত হইয়া, আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন ক-রেন। এবং তাহার ফল কি হয় তাহা তাহার কিয়ৎ পরেই এইরূপ বলিতেছেন যে,

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।

সাধক আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ

করিয়া আনন্দিত হ'ন—তিনি শোক হ-ইতে উত্তীর্ণ হ'ন পাপ হইতে উত্তীর্ণ হ'ন এবং অন্তঃকরণের কুটিলতা হইতে বিমুক্ত হইয়া অমর হ'ন। সাধকের শরীর যদি তাঁহার আত্মার মুখ্য অবলম্বন হইত তবে তাঁহার শরীরের বিয়োগেই তাঁহার আত্মার বিনাশ হইত; কিন্তু সাধকের আত্মার মুখ্য অবলম্বন নশ্বর দেহ নহে কিন্তু প্রা-ণের প্রাণ আনন্দ স্বরূপ নিত্য নির্বিকল্প অবিনাশী শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরমাত্মা;—এই জন্য সাধকের আত্মার বিনাশ একেবারেই অসম্ভব। মনুষ্যের আত্মা অমর হইয়া পরমাত্মার সহিত আনন্দ উপভোগ করি-বার জন্যই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতম শিখরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই প্রশান্ত সময়ে আত্মাকে প্রশান্ত করিয়া আমরা পরমাত্মার আরাধনা করি-তেছি। তিনি আমাদের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলদাতা। রসো বৈ সঃ তিনি রস স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু। তাঁহারই আরাধনাতে আমা-দের প্রাণ মন বাক্য রস মাধুর্য্যে পরিপ্লুত হয়—আত্মা প্রসন্ন এবং জ্যোতির্ম্ময় হয়।

হে পরমাত্মন্! প্রতি দিন যাহাতে আমরা শ্রদ্ধাভক্তির সহিত তোমার আরা-ধনা করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করি—এবং সংসার-ক্ষেত্রে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া সেই আনন্দের মূলে জল-সিঞ্চন করি, আমাদের প্রতি সেইরূপ ক-রুণা বিতরণ কর মনুষ্যজন্ম সার্থক হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন ঈশ্বর *।

ঈশ্বর কি? তাহা বলিতে হইলে প্রথ-মত এই দেখা আবশ্যক যে এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কি বিদ্যমান ছিল এবং কোথা হইতেই বা এই সকল দৃশ্যমান বস্তু উৎ-পন্ন হইয়াছে, কাহার দ্বারা বা ইহা রক্ষিত হইতেছে এবং পরিণামেই বা কোথায় গমন করিবে। কে বা আমাদিগের স্রষ্টা ও তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি কি প্রকার? বোধ হয় সকলেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনিই এই সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সৎস্বরূপ অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বহির্জগতের বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। বহির্জগতে আমরা কি দেখিতে পাই? না—কতকগুলি অস্থায়ী অপূর্ণ বস্তু যাহাকে আমরা জড়-পদার্থ বলিয়া জানি, যাহার রূপান্তর আছে, ক্ষয় আছে; যাহার নিজের এমন কোন শক্তি নাই যে আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে পারে। অতএব সত্য কি? কোন্ পদা-র্থকে সত্য বলিতে পারি? চৈতন্য পদার্থই সত্য; তদ্‌ভিন্ন আর কিছুই সত্য হইতে পারে না। আত্মাই চৈতন্য পদার্থ, সুতরাং তাহাই সত্য পদার্থ; যে বস্তু জড়পিণ্ড তাহা চৈতন্য পদার্থ নহে এবং তাহা সত্য পদার্থ নহে। অতএব উক্ত হইয়াছে এই জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কেবল এক চৈতন্যস্বরূপ সৎ পদার্থ ছিলেন, যাঁহার চৈতন্যে সকলেই সৃষ্ট ও প্রকাশিত হইয়াছে তিনিই সৎ-স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম; তাঁহা হইতে আর কেহই বৃহত্তর নাই।

যে কিছু পদার্থ আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের গোচর সে সমুদায়েরই ক্ষয় আছে এবং তাহারা যে ক্ষণকাল বিদ্যমান থাকে তাহা কেবল পরব্রহ্মের সত্তার প্রভাবে। এই সমুদয় জড়পদার্থের স্থিতি ও নাশ, নিত্য ঐশিক নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে। এই

* ১৮ আশ্বিন শুক্রবার। কালনা সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে পঠিত।

সকল নিত্য নিয়মের প্রয়োজক জগদীশ্বর স্বয়ং নিত্য; ইহার বিপরীত ক্ষণকালের জন্যও আমরা ভাবিতে পারি না। যত কিছু বস্তু আমরা দেখিতে পাই সকলেই অস্থায়ী অপূর্ণ, অদ্য একরূপ পরদিন অন্য-রূপ, সকলেরই পরিবর্ত্তন হইতেছে। সমুদায়েরই মধ্যে তিনিই নিত্য এবং অপ-রিবর্ত্তনীয়। পূর্ব্বে যেমন ছিলেন এক্ষণেও তেমনিই বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, জরা নাই, তিনি অজর অমর। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং, তাঁহার সমান আর কেহ নাই।

তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার জ্ঞানেতে সমু-দায় প্রকাশিত হইতেছে—তাঁহার নিকট ভূত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, সকলই বর্ত্তমান, কারণ আমাদিগের ন্যায় তাঁহার জ্ঞান সীমা বিশিষ্ট নহে। তাঁহার জ্ঞান পূর্ণ, তাঁহাতে আমাদিগের বাহ্য ইন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণাদি সম্ভবে না। ইন্দ্রিয় থাকিলে সেই ইন্দ্রিয়ের গতি যে পর্য্যন্ত জ্ঞানেরও সীমা সেই পর্য্যন্ত হইতে হইবেক। বাহ্য জগতের পর্ব্বতাদি বিবিধ বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের গতি রোধ করে এবং এই সকল প্রতিবন্ধক না থাকিলেও ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক শক্তি অসীমতার দিকে ধাবিত হইতে পারে না। এই অসীম জগতে চক্ষু একদৃষ্টিতে কতটুকুই বা দেখিতে পায়? কর্ণই বা কতদূরের শব্দ শুনিতে পায়? সকলেই জানেন যে সহজ অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির বিষয় অতি অল্প স্থানব্যাপী। ইহাও আপনাদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে মহা মহা পণ্ডিতদিগের অত্যদ্ভুত কৌশলসম্ভূত দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা মনুষ্যই বা জগতের কতটুকু একবারে দেখিতে সমর্থ হন। কি প্রাকৃতিক অবস্থায় কি যন্ত্রাদির সাহায্যে ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ জ্ঞান কখনই অসীম হইতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান অসীম ও পূর্ণ সুতরাং তিনি অচক্ষু, অকর্ণ এবং অশরীর। তাঁহার স্মরণশক্তির আবশ্যক নাই, জ্ঞানের আ-ধার জ্ঞান, জড়ের আধার জড়, এ নিমিত্ত কোন জড়ীয় আধার তাঁহাতে আবশ্যক হয় না, তিনি নিরাকার অব্রণ। জ্ঞানেতে জড় সকল প্রকাশিত হইতেছে। এই যে আমি অপূর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট জীব আমার জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে যে আমার জ্ঞানের উপর এই সকল প্রাচীর প্রস্তর কাষ্ঠ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু ইহারা আমাকে জানিতে পারিতেছে না, আমি ইহাদিগকে জানিতেছি; আমি অপূর্ণ হইয়া ইহাদিগকে জানিতেছি সেই পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ একবারে সকলি জানিতেছেন। আমাদিগের যেমন সকল বিষয়ের অভাব আছে এবং সেই অভাব পরিপূরণ করি-বার নিমিত্ত যেমন ইন্দ্রিয় হস্ত পদাদি আবশ্যক হয়, তাঁহার সে প্রকার কিছুরই অভাব নাই, তিনি স্বয়ম্ভূ; সুতরাং তিনি হস্ত পদাদি ভিন্ন কার্য্য করেন, চক্ষু ব্যতীত দর্শন করেন, কর্ণ ব্যতীত শ্রবণ করেন এবং পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা এক সময়ে সকলি জানিতে পারেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্বব্যাপী, কোন স্থানান্তরে গমন করিবার নিমিত্ত তাঁহার চরণ আবশ্যক হয় না; সকল স্থানে তিনি বিরাজ করিতেছেন, এমন স্থান নাই যেখানে তিনি নাই। তিনি পরি-পূর্ণ, সকল বস্তুতেই তিনি পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাতেই সকল বস্তু ওত-প্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অপূর্ণ আমি এখানে বর্ত্তমান থাকিয়া যখন নানা দেশ দেশান্তরের বস্তু সকল ধ্যান করিতে পারি-তেছি, উপরে অনন্ত কোটি নক্ষত্রমণ্ডল সকল জ্ঞানেতে কতকটা আয়ত্ত করিতে পারি-তেছি তাহা হইলে সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী

পূর্ণ-পরাৎপরের জ্ঞান কি মহান ও চমৎকার। তিনি সকলের নিয়ন্তা, নিয়ন্তা ব্যতীত কখন কোন নিয়ম হইতে পারে না। সকলেই তাঁহার নিয়মের অধীন, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কেহ কখন কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র সকলে তাঁহার নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেছে। কেবল এক তাঁহার নিয়মেই বাষ্প সকল সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা করিতেছে, সূর্য্য পর্য্যায় ক্রমে দ্বাদশ রাশিতে ভ্রমণ করাতে ঋতু সকলের আবির্ভাব হইতেছে। কি শারীরিক কি মানসিক কোন অবস্থাতেই তাঁহার নিয়ম অতিক্রম করিতে পারা যায় না। যখনি শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন কর তখনি শরীরগত কষ্ট পাও, যখনি মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন কর, তখনি মনস্তাপ পাও। তাঁহার শাসন সর্ব্বত্রই অপরিহার্য্য। তিনি দেশ কালের অতীত অথচ দেশ কালের মধ্যে থাকিয়া সকলকেই শাসন করিতেছেন, দেশ তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। কালেতে তাঁহাকে নিরূপণ করিতে পারা যায় না, এমন কেহ কখন বলিতে পারেন না যে তিনি অমুক কালে ছিলেন অমুক কালে ছিলেন না। কাল কখনই তাঁহাকে নিরূপণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন তিনি কাহারও অধীন নহেন, তিনি মুক্ত, তিনি আমাদের স্রষ্টা, আমরা তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছি সুতরাং তিনি আমাদের পিতা। এ জগৎ তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে সুতরাং জগতের সমুদায় বস্তু সৃষ্ট, এ নিমিত্ত সৃষ্ট বস্তু কখন মনুষ্যের উপাস্য দেবতা হইতে পারে না। এ আমাদিগের সামান্য অজ্ঞান ও ভ্রম নয় যে আমরা তাঁহার নির্ম্মিত বস্তুকে তিনি বলিয়া জ্ঞান করি। ঈশ্বর আমাদের দেবতা, আমরা সেই একের উপাসক। সেই দেশ কালের অতীতকে সীমাবদ্ধ করিয়া পূজা করি না। সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ভিন্ন কোন পরিমিত দেবতার নিকট আমরা নতশির হই না। তিনি ভিন্ন আর কেহ আমাদের আরাধনার পাত্র নহে, পূজার যোগ্য নহে। যেমন কাষ্ঠ পাষাণ পুত্তলিকা আমরা পূজা করি না, তেমনি আর এক প্রকার যে ভয়ানক পৌত্তলিকতা আছে তাহা হইতেও যেন আমরা বিরত হই, কোন মনুষ্যকে দেবরূপে কল্পনা করিয়া যেন পূজা না করি। যে ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ভজন পূজনে আপনাদিগকে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া কোন মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, ঈশ্বরের স্থানে অথবা ঈশ্বরের ব্যবধানে মনুষ্যকে দণ্ডায়মান করায়, মনুষ্যকে পাপীর গতি ত্রাণকর্ত্তা রূপে আরাধনা করে, ব্রাহ্মধর্ম্ম, সত্য ধর্ম্ম সে ধর্ম্মের বিরোধী। অতএব সাবধান যেন ঈশ্বরের স্থানে মনুষ্যকে স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শকে হীন ও কলঙ্কিত না কর। আবার ইহা অপেক্ষা আর একপ্রকার ভয়ঙ্কর পৌত্তলিকতা আছে। সে কি? না আপনাকে পূজা করা, আপনার হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাবের নিকট মস্তক অবনত করা। কেহ স্বার্থপরতার, কেহ ধনের, কেহ মানের, কেহ যশের, কেহ কামের এইরূপ এক এক পুত্তলিকা সাজাইয়া পূজা করিতেছেন। আমরা যেন বাহ্য, আধ্যাত্মিক সকল প্রকার পৌত্তলিকতা হইতে দূরে থাকি, সৃষ্ট পদার্থকে স্রষ্টার যোগ্য পূজা অর্চ্চনার পাত্র না করি, মনুষ্যকে ঈশ্বরের সিংহাসনে অধিরূঢ় না করি; ঈশ্বর ভিন্ন কোন পরিমিত পদার্থ যেন আমাদের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিতে না পারে।

সেই স্বর্গীয় প্রসাদ যেন জীবনের অন্ন হয়। সেই স্বর্গীয় বারি যেন আমাদের পানীয় হয়, পৃথিবীর মলিন পঙ্কিল জলে যেন আমরা তৃষ্ণা নিবারণ না করি, আমরা যেন মুক্ত কণ্ঠে বলি যে তিনি পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় আর আর সমুদায় বস্তু হইতে প্রিয়। তিনি মঙ্গল স্বরূপ, সকল ঘটনাতে সকল অবস্থাতে সকল কার্য্যেতে তিনি মঙ্গল বিধান করিতেছেন, মঙ্গলময়ের রাজ্যে অবশ্যই এমন সময় আসিবে যখন সকলই মঙ্গলের দিকে ধাবিত হইবেক, পরিণামে এ পৃথিবীর সকল মঙ্গল হইবেক, "প্রবাহ বলে নদীতীরস্থ গ্রাম ও নগর ভগ্ন হইতেছে, জলপ্লাবনে দেশ প্রদেশ প্লাবিত হইতেছে প্রলয় প্রবাত ও ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হওয়াতে লক্ষ লক্ষ জীবশ্রেণী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, মেঘগর্জ্জনসহকৃত মুহুর্মুহু বজ্রপাত দ্বারা পৃথিবীর কত অনিষ্ট হইতেছে, আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে এই সকল ঘটনা কি দুঃখজনক ব্যাপার কিন্তু ইহাতেও সেই মঙ্গলসঙ্কল্পের মঙ্গল উদ্দেশ্য সতত বিরাজ করিতেছে।" ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে আমরা যতই আলোচনা করিব, ততই হৃদয়ে আনন্দ উপভোগ করিব। তিনি আনন্দ স্বরূপ, আনন্দই তাঁহার শরীর। ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী অপূর্ণ বস্তুতে প্রীতি স্থাপন করা যায় না, সংসারে কেহই আমরা সম্পূর্ণ সুখী নহি, এখানে নানা দুঃখ, নানা বিপত্তি রোগ শোক দারিদ্র্য দুর্দ্দশা। অদ্য রাজা কল্য দরিদ্র, অদ্য মহোল্লাস কল্য হাহাকার। যদি এমন মনে কর যে বিষয়েতে প্রীতিস্থাপন করিলে তাহা হইতে সুখ পাইবে, তাহা ভ্রম—বিষয়েতে সুখ নাই তাহা কেবল বিষাদের আলয়, কারণ তাহা স্থায়ী বস্তু নহে, অদ্য আছে, কল্য নাই, তাহা অপূর্ণ। হে মানব, কেমন করিয়া অপূর্ণ বস্তু হইতে সুখ প্রাপ্তির আশা কর। তুমি কি জান না যে অপূর্ণ অস্থায়ী বস্তুতে মনুষ্যের কখনই তৃপ্তি লাভ হইতে পারে না, কারণ তাহার অভাবও অন্ত আছে। সেই অনন্ত স্বরূপের উপর নির্ভর না করিলে, কখনই আনন্দ পাইবে না, যত তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা করিবে, যতই জ্ঞানেতে আয়ত্ত করিতে যাইবে, ততই দেখিবে আত্মাতে নব নব ভাবের উদয় হইবে, ততই আনন্দ উপভোগ করিবে কারণ সে আনন্দের বিচ্ছেদ নাই, এবং বিচ্ছেদজনিত দুঃখও নাই।

তিনি শান্ত স্বরূপ, তাহাকে শান্তভাবে বিনীত ভাবে আমাদিগের জানিতে চেষ্টা করিতে হইবেক, চঞ্চল অপবিত্র হৃদয়ে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না এজন্য পূর্ব্ব পূর্ব্বে ঋষিরা এই বলিয়াছেন "শান্ত উপাসীত" তাঁহাকে শান্তভাবে উপাসনা করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কিছু নূতন ধর্ম্ম নহে, ইহা আমাদিগের প্রাচীন ঋষিদের ধর্ম্ম, ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিদ্বেষী হন তাঁহারা যেন আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থ বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি দর্শন করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে তৎসমুদায় কি উপদেশ দিয়াছে। যদি ঋষিদিগের বাক্য আমাদের অগ্রাহ্য হয় তবে কাহার বাক্য আমরা মান্য করিব? যদি ধূর্ত্ত কপট লোকের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে ধর্ম্মেও কাজ নাই কর্ম্মেও কাজ নাই। হা ভারত মাত! তোমার সন্তানেরা এক্ষণে কতকগুলি ধূর্ত্ত কপট লোকের কল্পিত জালে বদ্ধ হইয়াছে, তোমাকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিতেছে, তোমার স্বাধীনতা লোপ

করিয়া অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে, পূর্ব্বের মত তাহাদের সে উদ্যম নাই, যত্ন নাই, সাহস নাই, সত্য ধর্ম্মে আস্থা নাই; হা ঈশ্বর! তোমা ভিন্ন আর ভারতের গতি নাই। তোমার সন্তানেরা হীনবুদ্ধি হইয়া মোহে অন্ধ হইয়া তোমার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, যাহা তোমার সত্য ধর্ম্ম তাহাকে পদতলে দলিত করিতেছে, আমাদিগের এই পুরাতন উৎকৃষ্ট ভারতভূমিকে এক্ষণে ধর্ম্মশূন্য রাক্ষসভূমি করিয়া তুলিয়াছে। যে ভারত এক সময়ে ধর্ম্মের জন্য তেজীয়ান্ ছিল, যে ভারত ধর্ম্মের জন্য পৃথিবীতে সুবিখ্যাত হইয়াছিল সেই ভারতের কি এই প্রকার দুর্দ্দশা দেখিবে? হে ভারতবাসীগণ! উঠ জাগ, ধর্ম্মের জয় ভারতের জয় বলিয়া আবার ভারত উদ্ধারের সজ্জা কর; যাহাতে সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয় তাহার চেষ্টা কর।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

১১শ প্রস্তাব।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম, লক্ষ্মণের সহিত যজ্ঞ দর্শনার্থ মিথিলা নগরীতে সমাগত হইলে রাজা জনক আসিয়া তাঁহাদের সবিশেষ সৎকার করিলেন। সমস্ত দিন পরস্পরের মিষ্টালাপে অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাতে রাজর্ষি ঋষিসমীপে আগমন করিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজন্! এই ক্ষত্রিয়কুমারদ্বয় আপনার আলয়ে হরধনু দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছেন; আপনি ইঁহাদিগকে সেই শরাসন প্রদর্শন করুন; রাজর্ষি হরশরাসনের পূর্ব্ববৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন, আমি একদা হলযোগে যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলাম, এমন সময়ে লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে এককন্যা উত্থিত হইল। হলমুখবিনির্গতা বলিয়া আমি ঐ কন্যার নাম সীতা রাখিলাম। ঐ অযোনিসম্ভবা কন্যা আমার আলয়ে পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। অনন্তর আমি এই পণ করিলাম, যিনি হরকার্ম্মুকে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই ঐ কন্যা দিব। অনেকানেক রাজা আসিয়া সীতাকে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সীতা বীর্য্যশুল্কা বলিয়া, আমি কাহারও হস্তে তাঁহাকে প্রদান করি নাই।

হলমুখে সীতার জন্ম হইয়াছিল, একথা আমরা বাল্যাবধিই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইহার ভিতরে কতটুকু সত্য আছে, তাহা নিরূপণ করিবার অবসর আমাদের প্রায়ই ঘটে না। একটু চিন্তা করিলে মনে হয়, যে কোন যাগ যজ্ঞের অব্যবহিত পরে, হয়ত অপুত্রক রাজা জনক কন্যারত্ন লাভ করিয়া থাকিবেন, তাই প্রকৃত ঘটনাকে কবিত্বের আবরণে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলা হইল, যে হলমুখে সীতার জন্ম হইয়াছিল। যজ্ঞাদি দৈবক্রিয়া হইতে সীতার জন্ম, তাই সীতা অযোনিসম্ভবা। অথবা এমনও হইতে পারে মহর্ষি বাল্মীকি পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্দীপন করিবার জন্য, স্বীয় মহাকাব্যের নায়িকার জীবন ও মৃত্যুকে রহস্যময় করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

যজ্ঞক্ষেত্রে হলমুখ হইতে সীতার জন্ম, ইহার তাৎপর্য্য যে আমরা এইরূপ অনুমান করিতেছি, তাহারও কতকটা হেতু আছে। অনেকেরই সংস্কার আছে, যে সংস্কৃত সাহিত্যে নায়িকাকুলের মধ্যে সীতাই বুঝি একমাত্র অযোনিসম্ভবা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মহাভারতে দ্রৌপদীও এই বিশেষণে অভিহিতা। পাঠক-

বর্গের জন্য মহাভারত হইতে আমরা সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি

> দ্রুপদস্য সুতা হেষ্যা বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা
> অযোনিজা মহাভাগা স্নুষা পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ।
>
> বনপর্ব্ব, ২৭ অধ্যায়, ৫ম শ্লোক।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, দেখুন এই কৃষ্ণা দ্রুপদ-রাজের দুহিতা, বেদিমধ্য হইতে সমুত্থিতা, অযোনিসম্ভবা, মহাভাগা ও পাণ্ডুর পুত্র-বধূ। এক্ষণে বিবেচনা করুন, "অযোনিজা যজ্ঞক্ষেত্র বা বেদী মধ্য হইতে উত্থিতা" এই দুই বিশেষণ যদি দ্রৌপদীতেও প্রয়োজ্য হয়, তবে সীতা সম্বন্ধে তাহাদিগের বিশেষত্ব কোথায় রহিল?

এ দেশের সৌভাগ্যক্রমে পবিত্র রাম-চরিত সকলের ভিতরে সমধিক অধীত ও আলোচিত, তাই সীতার জন্মরহস্য সাধারণের স্মৃতিপথে সমধিক মুদ্রিত ও জাগ্রত; কিন্তু দ্রৌপদী সীতার ন্যায় সর্ব্বসাধারণের গৌরবের পাত্রী নহেন বলিয়া তাঁহার জন্ম-রহস্য সাধারণের নিকটে নিতান্তই অপরিচিত। তাই সকলে সীতা সম্বন্ধে ঐ বিশেষণ গুলিতে যেন কিছু বিশেষত্ব দেখেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোন্ গ্রন্থখানি অগ্রে রচিত, তৎসম্বন্ধে বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। অনেকে বলেন মহাভারতে রামচন্দ্রাদির উল্লেখ আছে,কিন্তু রামায়ণে কুরু পাণ্ডবদিগের নাম গন্ধও নাই,এ কারণে রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্বরচিত। অনেকে আবার রামায়ণ ও মহাভারতের রচনা পার্থক্য দেখাইয়া, মহাভারতকে রামায়ণের পূর্ব্বে স্থান দেন। এখানে তাহা লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিবার আবশ্যক নাই। রামায়ণ ও মহাভারত মিলাইয়া রামচন্দ্রের বাল্যজীবনের ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কোন মতেই সামঞ্জস্য করিয়া উঠিতে পারি নাই। মূল-রামায়ণের প্রারম্ভে, বাল্মীকি কর্ত্তৃক নারদ জিজ্ঞাসিত হইলে, নারদ কিঞ্চিদূন শত-শ্লোকে যে রামজীবনের স্থূল স্থূল ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহার ভিতরে তিনি বিশ্বামিত্রের সহিত রামচন্দ্রের বনগমন, তাড়কাবধ, অহল্যা-উদ্ধার, হরধনু ভঙ্গ প্রভৃতি আবশ্যক ঘটনার আদৌ উল্লেখ করেন নাই। দশরথ প্রীতমনে রাম-চন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে অভিলাষী হইয়া দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিলে, কৈকেয়ী রাজার বরদান প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন; নারদমুখে এই স্থান হইতে রামায়ণ আরম্ভ। আবার মহাভারতের বনপর্ব্বের ২৭২ অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়া দেখি, বিশ্বামিত্রের সহিত রামলক্ষ্মণের বনগমন, তাড়কা নিধন, অহল্যা উদ্ধার, হরধনু ভঙ্গাদি কিছুরই উল্লেখ পাই না। মহাভারতের ভিতরে কিছু দুই এক অধ্যায়ে রামচরিত শেষ হয় নাই, যে এই গুলি বাদ দিবার আবশ্যক হইয়াছিল। বনপর্ব্বের ২৭২ অধ্যায় হইতে ২৯১ অধ্যায়ে রামায়ণের সবই আছে, কেবল দেবত্ব-সূচক ও বিস্ময়-উদ্দীপক ঐ কয়েকটি ঘটনার কোন উল্লেখ নাই।

আমরা রামজীবনী সম্বন্ধে একদিকে নারদের উক্তি পাইতেছি; আর একদিকে মহাভারতের আশ্বাস পাইতেছি; ইহাতে দেখিতেছি যে রামজীবনের ঐ ঘটনাগুলি সম্বন্ধে নারদোক্তি ও মহাভারত উভয়ই নিঃস্তব্ধ। মহাভারত রামায়ণের পূর্ব্বরচিত হইলে বাল্মীকি এই সকল ঘটনার মূল কোথা হইতে পাইলেন। মহাভারত রামায়ণের পররচিত হইলে, মহাভারতকার তাড়কা নিধন, অহল্যা উদ্ধার,বিশ্বামিত্রসহ

মিথিলায় গিয়া হরধনুভঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় অত্যাবশ্যক ঘটনা কেনই বা ছাড়িয়া দিলেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। যদি কেহ বলেন রামায়ণের ঐ সকল অংশ বাল্মীকির রচনা নহে, অন্য কর্ত্তৃক রচিত হইয়া বহুকাল পরে সংযোজিত হইয়াছে, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা। আমরা এখানে পাঠকগণের অভিরুচির উপরে মীমাংসার ভার দিয়া অবসর লইলাম।

রাজা জনকের আদেশে শকটস্থিত ও লৌহনির্ম্মিত মঞ্জুষা মধ্যে স্থাপিত শৈব-ধনু পাঁচ হাজার মনুষ্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া আনীত হইল। রামচন্দ্র একাকী ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। (৬৭ সর্গ) কোদণ্ড বজ্রনির্ঘোষে দ্বিধা ভগ্ন হইয়া গেল। বিশ্বামিত্র, জনক, রাম ও লক্ষ্মণ ভিন্ন আর সকলেই সেই প্রচণ্ড শব্দে হতচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। সকলে আ-শ্বস্ত হইলে জনক কহিলেন, আমি প্রাণ-সমা জানকীকে রামহস্তেই অর্পণ করিব। এই বলিয়া দশরথকে আনিবার জন্য অযোধ্যায় দূত প্রেরণ করিলেন।

পাঁচ হাজার লোক ধনুক টানিয়া আনিয়াছিল, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের কথা বলিতে হইবে; কিন্তু সংখ্যা সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের প্রলাপোক্তি সর্ব্বত্রই সমান। বাল্মীকি রামায়ণের এই বালকাণ্ডে আরও কয়েকটি স্থানে সহস্র শব্দের উল্লেখ আছে। বিশ্বামিত্র রামকে প্রার্থনা করি-বার জন্য দশরথের নিকট যাইলে, রাজা বলিলেন এক্ষণে আমার ষাট হাজার বৎসর বয়স হইয়াছে ও আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। (১০ম শ্লোক, ২০ অধ্যায়)। রাম এখনও ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই। (২ শ্লোক, ২০ অধ্যায়) রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করা রামের সাধ্যায়ত্ত নহে। (আমাদের বিবেচনায় রাক্ষসবধের সময় রামের বয়স ষোড়শ বৎসরের অধিক হইয়া থাকিবে, পুত্রের প্রতি বাৎসল্য হেতু দশরথ বলিতেছেন, রাম এখনও শিশু, ষোড়শ বৎসর অতিক্রম করে নাই)। তাড়কাবধান্তে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিথিলায় গিয়া সীতার সহিত রামের বিবাহ হয়। বিবাহান্তে সীতা রামের সহিত দ্বাদশ বর্ষ নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করেন (৭৭ সর্গের ২৫ শ্লোকের টীকা দেখ) আবার এখানে পাইলাম, পাঁচ হাজার মনুষ্য শকটসহ ধনু টানিয়া আনিয়াছিল। এই কয়েক স্থানে সংখ্যার যে উল্লেখ পাইলাম, তাহাতে মনে হয় যে সহস্র শব্দের কোন অর্থ নাই, ইহা বহুত্ববাচক মাত্র, কোন নি-র্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায় না। দশরথের বয়স যে ষাট হাজার বৎসর হইয়াছিল, টীকাকারদি-গের প্রমাণেও তাহা অতিরঞ্জিত, তাহার অর্থ হয়ত ষাট বৎসর মাত্র। ধনু আনয়নে পাঁচ হাজার মনুষ্যের যে উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ ও ঐরূপ বুঝিয়া লইবে। এইরূপ না হইলে ষাট হাজার বৎসর বয়স্ক দশরথের ষোড়শ বৎসর বয়স্ক পুত্রের সঙ্গতি কোথা। চল্লিশ বৎসরের পরে অসময়ে দশরথের পুত্র রামের জন্ম হইয়া থাকিবে। মনুষ্য জীবনকে চারিভাগে বিভাগ করিলে প্রথম বয়স বাল্য, তাহার পরে যৌবন, তৎপরে প্রৌঢ়, শেষে বার্দ্ধক্য। যৌবনেই সন্তা-নাদি জন্মিয়া থাকে। দশরথের বয়স ষাট হাজার বৎসর হইলে তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থায় অর্থাৎ তাঁহার ৪০ কি ৪৫ হাজার বৎসর বয়সে রামের জন্ম হইয়া থাকিবে। এরূপ হইলে রামের বয়স ষোল বৎসর থাকা কোন মতেই দাঁড়ায় না। এ দিকে আবার রামের বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহার বিবাহ হয়। পিতার বয়স ষাট

হাজার বৎসর হইলে, তাঁহার পুত্রের ষোল বৎসর বয়সে সূতিকাগৃহে থাকাই সম্ভব; বিবাহ ত দূরের কথা। কিন্তু ষাট হাজার বৎসর বয়সের অর্থ ষাট বৎসর ধরিলে, চারিদিকেই সঙ্গতি থাকে, কোনরূপ গোলযোগ হয় না। বালকাণ্ডের ভিতরে সহস্র শব্দের অর্থ ত এইরূপ বুঝিলাম। সমস্ত রামায়ণের ভিতরে এই অর্থ দাঁড়াইবে কি না তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে।

ক্রমশঃ।

কালনা ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাবিংশ উৎসব উপলক্ষে সম্পাদকের পত্র।

মহাশয়,

নানা বিঘ্ন বিপদ ও উৎসব আনন্দের মধ্য দিয়া কাল্না ব্রাহ্মসমাজ আজ ২৯ বর্ষে আসিয়া উপস্থিত। পরমেশ্বরের কৃপায় সকল বিঘ্নই অপসারিত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে দেশে ধর্ম্ম সভা, আর্য্য সভা, প্রার্থনা সভার অধিবেশন হইয়া অলক্ষিতে ব্রাহ্মসমাজেরই অঙ্গপোষণ করিতেছে। কারণ মন্দীভূত ধর্ম্মভাব,ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উন্মেষিত হউক, ব্রাহ্মসমাজের এই উদ্দেশ্য। ভারতে যখন যখন ধর্ম্মভাবে জড়তা ও আমোদপ্রিয়তা আসিয়া ধর্ম্মভাব মলিন করে তখনই ভগবান এক একজন প্রতিভাশালী অসাধারণ মনুষ্যকে আবির্ভূত করিয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলেন। সেই প্রাদুর্ভূত একজন মানুষের চেষ্টায় যত্নে অধ্যবসায়ে যে শুভফল ও যে উপকার হয়, সহস্র সহস্র লোকের কায়মন চেষ্টাতে তাদৃশ উপকার হয় না।

দেখুন একজন মানুষের উৎসাহে, উদ্যমে, অর্থানুকূল্যে মন্দীভূত ব্রহ্মোপাসনা ক্রমশঃ উদ্দীপিত হইতেছে। ধর্ম্মপ্রসঙ্গে আজও যিনি যুবার ন্যায় উদ্যমশীলতা, ও ধর্ম্মযুদ্ধে বীরের ন্যায় সাহস প্রদর্শন করিয়া থাকেন। "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি" এবং "পরলোক ও মুক্তি" নামক পুস্তক দ্বয়ই এ কথার দেদীপ্যমান উদাহরণ।

একজনের যত্নে চেষ্টায় এবং অর্থানুকূল্যে যখন এত উপকার হইতেছে, তখন শিক্ষিত যুবক বৃন্দের সহানুভূতি পাইলে আমরা কালে আর্য্য নামের যোগ্য হইতে নিশ্চয়ই পারিব। সুখের বিষয় যে আজ কাল অনেক শিক্ষিত সহৃদয় লোকের সহানুভূতি দেখিতেছি। কাল্না ব্রাহ্মসমাজের জীর্ণ সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনায় অনেকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। আনুমানিক ৩৫০ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। কালনা সমাজের অন্যতম ট্রষ্টী বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে অর্থসঞ্চয় হইতেছে। সদৃষ্টান্তে লোকের অনুরাগ প্রবর্দ্ধিত হয়। এই কারণে দাতাদিগের নাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ করিলাম।

শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী	১০৲
„ „ তারাদাস ভট্টাচার্য্য	১০৲
„ „ মহেন্দ্রলাল গুপ্ত (বর্দ্ধমান)	১০৲
„ „ মহেন্দ্রলাল সিংহ (কালনা)	৫৲
„ „ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৲
„ „ বেনয়ারিলাল বিশ্বাস	৫৲
„ „ উপেন্দ্রলাল হাজরা	৫৲
„ „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
„ „ বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী	৬৲
„ „ ভৈরবচন্দ্র পালিত	৫৲
„ „ বিনোদলাল সেন কবিরাজ	৫৲
„ „ পুলিনচন্দ্র রায়	৫৲
„ „ যদুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
„ „ মতিলাল সিংহ	২৲
„ „ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৫৲
„ „ কালনা ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক	৫৲

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬, আশ্বিন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩১৪ /৬
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১৯৮৮৶৩
সমষ্টি	৩৫১৩ ৻৯
ব্যয় ...	৩২৯।/৩
স্থিত	৩১৮৩॥৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ		২৪৬৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়		২৪০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরী		৫৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র বসু		১৲
		২৪৬৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		৬৫৲
সৈয়দনবাব আলি চৌধুরী,	ধনবাড়ী	৬৸০
শ্রীযুক্ত সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ,	কালনা	১৸৵০
শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর,	দিনাজপুর	৩৷৶০
শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সরকার,	কলিকাতা	৩৲
„ „ কালীকুমার ঘোষ,	ঐ	৪৲
„ পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	ঐ	৩৲
„ বাবু মণিলাল মল্লিক,	ঐ	৩৲
„ „ উমেশচন্দ্র দেব,	ঐ	৩৲
„ „ হেমলাল পাইন,	ঐ	৩৲
„ „ কমলাল বর্ম্মন,	ঐ	৩৲
„ „ জানকীনাথ মজুমদার,	ঐ	৩৲
„ „ আশুতোষ ধর,	ঐ	৩৲
„ „ বনমালী চন্দ্র,	ঐ	৩৲
„ „ ব্রজনাথ দত্ত,	ঐ	৩৲
„ „ বলাইচাঁদ মল্লিক,	ঐ	৩৲
„ „ হেমচন্দ্র ঘোষ,	ঐ	৩৲
„ „ সুরেশচন্দ্র দত্ত,	ঐ	১৲
„ „ ক্ষেত্রমোহন ধর,	ঐ	২৲
„ „ গোপালচন্দ্র দে,	ঐ	১৲
„ „ রামলাল বসু,	ঐ	২৲
৺ যদুলাল মল্লিক,	ঐ	৩৲
প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১ম ভাগ এক খণ্ড নগদ বিক্রয়		৪৲
		৬৫৲
পুস্তকালয়		৩ /৬
সমষ্টি		৩১৪ /৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৮৬ ৻৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৯৸/০
পুস্তকালয় ...	২১৸৵৬
যন্ত্রালয় ..	৯১॥/৩
সমষ্টি	৩২৯।/৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অদ্য হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পদে নিযুক্ত করা হইল।

৩০ কার্ত্তিক,১৮১৭ শক। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
আচার্য্য।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
প্রথম ভাগ।
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৬।

৬২১সংখ্যা ১৮১৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে গার্হস্থ্য উপাসনার সময়

আচার্য্যের উপদেশ।

২ অগ্রহায়ণ। রবিবার।

পশুর মনের সহিত মনুষ্যের মনের অনেক স্থানে ঐক্য আছে দেখিয়া, উভয়ের মধ্যে এক স্থানে যে একটি মর্ম্মগত প্রভেদ আছে, তাহার প্রতি যেন আমরা অন্ধ না হই। সম্মুখে কোনো লোভনীয় সামগ্রী দেখিলে পশুপক্ষীর মন যেমন আকৃষ্ট হয়, মনুষ্যের মনও তেমনি আকৃষ্ট হয়; সম্মুখে কোনো ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিলে পশুপক্ষীর মনও তাহা হইতে প্রতিহত হয়, মনুষ্যের মনও তাহা হইতে প্রতিহত হয়; নিজের অধিকৃত বিষয় অন্য-কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে পশু পক্ষীরও মনে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, মনুষ্যের মনেও ক্রোধ উৎপন্ন হয়; এইখানে দুয়ের মধ্যে ঐক্য। কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, মনুষ্যের মন প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেও, ভয়ে অভিভূত হইলেও, ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইলেও, সে অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা, একবার অন্ততঃ, জ্ঞানের নিকটে জিজ্ঞাসা করে। সাধু ব্যক্তি জ্ঞানের কথা শুনিয়া চলেন; অসাধু ব্যক্তি জ্ঞানের কথা শুনিতে চাহে না। পশু পক্ষীরা যদিও অনেক সময়ে উপস্থিত বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করে, কিন্তু কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহারা কোনো কথা জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করে না। এইখানে পশুর মন এবং মনুষ্যের মন উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞান কেবল মনুষ্যকেই বলে যে, তোমার উপার্জ্জিত বিষয়ে যেমন তোমার অধিকার অন্যের উপার্জ্জিত বিষয়ে তেমনি অন্যের অধিকার; অতএব অন্যের ধন অপহরণ করিও না; মনুষ্যকেই কেবল বলে যে, এক জনের যাহা মঙ্গল তাহা সকল লোকেরই মঙ্গল, অতএব সকল লোকেরই মঙ্গল চিন্তা এবং মঙ্গল চেষ্টা করিবে। জ্ঞানের এই সকল হিতবাক্যে শ্রদ্ধা সংস্থাপন করা সদ্ভাবের প্রধান লক্ষণ; এবং জ্ঞানের হিতবাক্যে অশ্রদ্ধা করাই অসদ্ভাবের প্রধান লক্ষণ। এমন কি, জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাই সদ্ভাবের মূল—সদ্ভাব ধর্ম্মের মূল; জ্ঞানের প্রতি

অশ্রদ্ধাই অসদ্ভাবের মূল, অসদ্ভাব অধর্ম্মের মূল।

অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে লোক-সমাজ একেবারেই উৎসন্ন হইয়া যায়;—তাহা যাহাতে না হইতে পায় তাহারই জন্য রাজশাসন হইয়াছে। রাজশাসনের ভয়ে লোকে পরস্পরের অধিকার লঙ্ঘন করিতে এবং পরস্পরের প্রতি প্রকাশ্য অত্যাচার করিতে সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু রাজশাসন কেবল অধর্ম্মের কণ্টকাকীর্ণ শাখা প্রশাখা কর্ত্তন করে, অধর্ম্মের মূল উচ্ছেদ করিতে পারে না। রাজশাসন চৌর্য্য দস্যুতা নরহত্যা প্রভৃতি নিবারণ করে, কিন্তু অন্তঃকরণের দ্বেষ হিংসা লোভ মত্ততা ঈর্ষা প্রভৃতির কোনো প্রতীকার করিতে পারে না। রাজশাসন যেমন ন্যায়ের প্রবর্ত্তক, সামাজিক শাসন তেমনি বিনয়ের প্রবর্ত্তক। সামাজিক শাসন মনুষ্যকে বিনয় শিক্ষা দেয়—সৌজন্য শিষ্টাচার এবং ভদ্র ব্যবহার শিক্ষা দেয়। কিন্তু রাজশাসনই হউক আর সামাজিক শাসনই হউক কোনো বাহিরের শাসনই লোকের অন্তঃকরণ-রাজ্য অধিকার করিতে পারে না। মনুষ্যের অন্তরতম প্রদেশ রাজ-বলেরও বশীভূত নহে, লোক-বলেরও বশীভূত নহে। কেবল মঙ্গল ইচ্ছা এবং বিশুদ্ধ প্রীতির বলের সমক্ষে মনুষ্য সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত মস্তক অবনত করে। যাঁহার অসীম মঙ্গল ইচ্ছা সকলেরই প্রতি সমান সেই অন্তর্যামী পরমাত্মাই মনুষ্যের অন্তরের অধিপতি। তিনি চাহেন যে আমরা আপন ইচ্ছায় তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া সদ্ভাব এবং সাধুভাব হৃদয়ে পোষণ করি; দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি কোনো অসদ্ভাবকে হৃদয়ে স্থান না দিই। কেননা অসদ্ভাব আত্মার ব্যাধি। পুত্রের শরীরে রোগের সূত্রপাত হইলে পিতামাতা যেমন তাহা জানিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকারের জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নানা উপায় অবলম্বন করেন; মনুষ্য তেমনি অন্তঃকরণ মধ্যে দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি অসদ্ভাব পোষণ করিলে পরমাত্মার মঙ্গল ইচ্ছার প্রভাবে সমস্ত প্রকৃতি তাহার প্রতিবিধানের জন্য অলক্ষিত ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। ইহা অভ্রান্ত বাক্য যে, তুমি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী হও, তবে সমস্ত প্রকৃতিই তোমার ইচ্ছার বিরোধী হইবে। অতএব সাবধান! অসদ্ভাব যেন কদাপি অন্তঃকরণে মূল বিদ্ধ করিতে না পারে। অসদ্ভাব যেমন অন্তঃকরণের ব্যাধি; সদ্ভাব তেমনি অন্তঃকরণের স্বাস্থ্য। মনুষ্যের মন যখন ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্ভাবে পরিপূর্ণ হয়, তখনই মনুষ্য কঠোর বলের রাজ্য হইতে ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে সমুত্থান করিয়া সুবিমল আনন্দ উপভোগ করে।

হে পরমাত্মন! আমাদের প্রতি তোমার অপার করুণা। তোমার দুরবগাহ মঙ্গল অভিসন্ধি কে বুঝিবে! আমাদের দেশে অজ্ঞান মোহ এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া উপযুক্ত সময়ে তুমি আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছ;—ইহার অমৃত ফল যখন ফলিবে তখন আমাদের দেশে প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবার তোমার উপাসনা করিয়া জীবন সার্থক করিবে; তখন তোমার সুবিমল প্রসাদবারির সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে সদ্ভাব এবং সাধুভাব অবতীর্ণ হইবে, এবং তাহা যখন ক্রমশঃ কার্য্যে অভিব্যক্ত হইতে থাকিবে তখন ধর্ম্মের প্রভাবে আমাদের দেশের মলিন মুখ নূতন শ্রীতে সমুজ্জ্বল হইবে। হে

অগতির গতি করুণাময় পিতা! তোমার নিকটে কি আর প্রার্থনা করিব—তোমার ইচ্ছা সফল হউক, জগতের মঙ্গল হউক।

---

৯ অগ্রহায়ণ। রবিবার।

বিদ্যালয়ে আমরা দেখিতে পাই যে, যে বালক যখন যে শ্রেণীতে আছে তখন সেই শ্রেণীর উপযুক্ত পাঠাভ্যাসে যত্নশীল হয়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্ত্তী উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হয়। তেমনি মঙ্গলময় পরমেশ্বর যাঁহাকে যে অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার উচিত যে, তিনি সেই অবস্থার উপযুক্ত কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত থাকেন এবং সেই সঙ্গে উন্নত অবস্থায় উঠিবার জন্য প্রস্তুত হ'ন।

মনুষ্য স্বীয় কর্ম্মগুণে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অবস্থার প্রভু এবং অবস্থার দাস। সেই মনুষ্যই অবস্থার প্রভু যিনি সকল অবস্থাতেই সর্ব্বদা অবহিত হইয়া ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকেন! সেই মনুষ্যই অবস্থার দাস, যিনি অনুকূল অবস্থার কুহকে ভুলিয়া অথবা প্রতিকূল অবস্থার বিভীষিকায় ভয় পাইয়া ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু মনুষ্য এক দিনেই অবস্থার প্রভু হইতে পারে না। অবস্থার প্রভু হইতে হইলে যথোপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন এবং শিক্ষালাভ করিতে হইলে যথোপযুক্ত সাধনের প্রয়োজন। আমরা দেখিতে পাই যে, যিনি সুনিপুণ শিক্ষকের উপদেশ অনুসারে প্রত্যহ অশ্বে আরোহণ করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে দৃঢ়রূপে রাস ধরিয়া বিধিপূর্ব্বক অশ্বকে চালনা করেন, তিনিই ক্রমে অশ্বের উপরে কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। ধর্ম্ম শিক্ষারও সেইরূপ প্রণালী। কোন্ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা একজন সুবিজ্ঞ ধর্ম্মপরায়ণ আচার্য্যের নিকট হইতে উপদেশ লইয়া যিনি সকল অবস্থাতেই সর্ব্বদা আপনাকে ধর্ম্মপথে অটল রাখিতে যত্নবান হন তিনি ক্রমে অবস্থার উপরে কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। পদ্মানদীর মাঝিরা এপ্রদেশের মাঝিদিগের অপেক্ষা নাবিকতা-কার্য্যে এত অধিক পারদর্শী হইল কিসে? পদ্মানদীর প্রবল স্রোত এবং ভীষণ তরঙ্গের সহিত অষ্টপ্রহর সংগ্রাম করিয়াই তাহারা আপন ব্যবসায়ে ঐরূপ অসামান্য নিপুণতা লাভ করিয়াছে। নদীর স্রোত অনুকূলই হউক আর প্রতিকূলই হউক্ মাঝি যেমন সর্ব্বদাই হাল ধরিয়া থাকে, সেইরূপ সাংসারিক অবস্থা অনুকূলই হউক্ আর প্রতিকূলই হউক্—মনুষ্যের কর্ত্তব্য যে তিনি সর্ব্বদাই নিবিষ্ট-চিত্তে ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকেন। এইরূপ শিক্ষা এবং সাধনের গুণে—যে মনুষ্য প্রথমে অবস্থার দাস ছিল সে মনুষ্য ক্রমে অবস্থার প্রভু হইয়া আনন্দে ঈশ্বরের গুণ গান করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন

"সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ং।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা॥"

সুখই হউক্ আর দুঃখই হউক্ প্রিয়ই হউক্ আর অপ্রিয়ই হউক্ যাহা যাহা ঘটিবে অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবে; কি প্রকার অপরাজিত চিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাহা পরের শ্লোকে বলিতেছেন

"প্রিয়ে নাতিভৃশং হৃষ্যেৎ অপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ।
ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রে, ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ॥"

প্রিয় লাভ হইলে অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে না, অপ্রিয় ঘটনা হইলেও ম্রিয়মান হইবে না, ধনকষ্ট হইলে মুহ্যমান হইবে না এবং ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না। অপরিপক্ব দুর্ব্বল মনের লক্ষণ এই যে, অবস্থা অনুকূল হইল তো অমনি হর্ষে উন্মত্ত হইয়া উঠে—প্রতিকূল হইল

তো অমনি বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এইরূপ অপরিপক্ক অন্তঃকরণের নিকটে অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয়-বিধ সাংসারিক অবস্থাই কর্ত্তব্য সাধনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। অনুকূল অবস্থায় লোকে কোথায় মঙ্গলদাতা পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মাচরণে মন দিবে, তাহা দূরে থাকুক্ অবোধ মনুষ্য তখন অবস্থার কুহকে মুগ্ধ হইয়া পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া যায়—পৃথিবীর ক্ষণিক সুখকেই সার জ্ঞান করে—এবং অলীক ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মনে করে। প্রতিকূল অবস্থায় লোকে কোথায় পরমেশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়া তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া বিপদের প্রতীকার কার্য্যে সাধ্যানুসারে মনোনিবেশ করিবে, তাহা দূরে থাকুক্ অজ্ঞানান্ধ মনুষ্য তখন পরমেশ্বরের ন্যায়ের প্রতি দোষারোপ করে এবং কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিপদের উপর বিপদ ডাকিয়া আনে। হর্ষের উন্মত্তভাব এবং বিষাদের ম্রিয়মাণ ভাব এ দুয়ের মধ্যস্থলে মনের একরূপ সচ্ছন্দতা এবং সাম্যভাব আছে, যাহা শারীরিক স্বাস্থ্যের সহিত উপমেয়; তাহাকে আমরা বলি প্রসন্নতা। প্রসন্নতা হর্ষের ন্যায় অধীরও নহে, বিষাদের ন্যায় ভারবহ এবং তমসাচ্ছন্নও নহে; তাহা গম্ভীর প্রশান্ত এবং নির্ম্মল। কর্ত্তব্য কার্য্য করিলে আমাদের মন যেরূপ সুপ্রসন্ন হয় মনের সেইরূপ প্রসন্নতাকে আমরা বলি আত্মপ্রসাদ। যাঁহারা সংসার-সংগ্রামে অপরাজিত চিত্তে ধর্ম্মকে অটল রাখেন তাঁহাদেরই অন্তঃকরণে আত্মপ্রসাদ স্থায়ী হয়; এবং যাঁহার অন্তঃকরণে আত্মপ্রসাদ স্থায়ী হয়, তাঁহাকে সম্পদেও ভুলাইতে পারে না বিপদ্ও অভিভূত করিতে পারে না—সকল অবস্থাতেই তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন এবং সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করে। 'ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ'—যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করে।

হে পরমাত্মন্! এই পবিত্র প্রাতঃকালে তোমার চরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাদের সকলের প্রতি তোমার প্রসাদবারি বিতরণ কর। আমাদের আত্মাকে সেই স্বর্গীয় প্রেমসুধায় উত্তেজিত কর, যাহাতে আমরা সুখে দুঃখে এবং সম্পদে বিপদে ধর্ম্মের পথে অটল থাকিয়া তোমার পুত্র নামের যোগ্য হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পারায়ণ। *

এই উৎসবাধিষ্ঠাতা নিখিল বিধাতার বরণীয় পদে বার বার নমস্কার। তাঁহার কৃপা কটাক্ষ ভিক্ষা করি। হে দেব! প্রসন্ন হও; হে দেব প্রসন্ন হও।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবের একটী বিশেষ লক্ষণ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পারায়ণ। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সায়াহ্নে এই অনুষ্ঠান যথাবিধি সম্পন্ন হইল। অদ্যকার উৎসবক্ষেত্রে আমরা সঙ্কল্পারূঢ় হইতেছি যে, এই শুভ অনুষ্ঠান যাহাতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, তাহার চেষ্টা করিব। সিদ্ধিদাতা বিধাতা আমাদের সহায় হউন।

পারায়ণ শব্দের অর্থ এক গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠ। নিয়ম পূর্ব্বক পাঠ আরম্ভ ও সমাপ্ত

* এই প্রবন্ধ বিগত ৩০ কার্ত্তিক শুক্রবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সভায় পঠিত হয়।

করা আবশ্যক। আমরা ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন অন্য কোন ব্রত বিধি-পূর্ব্বক অবলম্বন ও তাহার উদ্‌যাপন করি না। ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এক ব্রত বি-শেষ। তাহা তদ্রূপে সম্পাদন করা উ-চিত। বেহালা ব্রাহ্মসমাজে এই অনু-ষ্ঠানের আরম্ভ হইয়া তাহা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

পরন্তু, ইহা কেবল একদিনের ব্রত হওয়াও বিহিত নহে। অর্থবোধ সমেত, ধর্ম্ম চিন্তা সমেত, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা সমেত পাঠ না করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠের কোন ফল হইবে না। এই পারায়ণে আমাদের বাক্য শুদ্ধ হইবে, স্বর সুমিষ্ট হইবে, কর্ণ পরিতৃপ্ত হইবে, এবং প্রাণের সহিত সকল অঙ্গ অমৃতা-ভিষিক্ত হইবে। এই মহদর্থ সাধনার নিমিত্ত ইহার নিয়ম এই থাকুক যে, প্রতিদিন শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে একটী করিয়া মন্ত্র পাঠ হইবে; এবং সমস্ত বৎসরের মধ্যে পারায়ণ সম্পূর্ণ হইবে। এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫৭+১৩৮=২৯৫ সংখ্যক মন্ত্র আছে। বাধা বিঘ্ন প্রযুক্ত ৭০ দিবস পাঠ না হইলেও সম্বৎসরে ৩৬৫ দিনে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থের এক আবৃত্তি অনায়াসে সম্পূর্ণ হইতে পারিবে। অথবা প্রতি সপ্তাহে একদিন ৭টী করিয়া মন্ত্র পাঠ করিলে ৪২ সপ্তাহে পাঠ সমাপ্ত হইবে। আর ১০ সপ্তাহ কাল বিভিন্ন কারণে ব্যাহত হইলেও সম্বৎসরে এই পারায়ণ ব্রতের উদ্‌যাপন কঠিন হইবে না।

প্রাচীন ব্যবস্থা এইঃ—

তপোবিশেষৈর্ব্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ
বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যোদ্বিজন্মনা।
মনু ২। ১৬৫

বিশেষ তপ অর্থাৎ নিয়ম কলাপ এবং নিত্য স্নানাদি বিবিধ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক বেদ ও উপনিষৎ সম্যক্ অধ্যয়ন করিবে।

আমরা সেই বেদ প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা পাঠ করি না। এজন্য তাহার অধিগম আমাদের ঘটে নাই। তাহার ফলও আমাদের কর্ম্মানু-রূপ হইতেছে না। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বেদ, তদ্‌বিষয়ে দ্বিরুক্তি নাই; সংযত হইয়া ইহা নিত্য অধ্যয়ন এবং বর্ষে বর্ষে ইহার এক আবৃত্তি বা পারায়ণ সম্পূর্ণ করিলে আমাদের বেদাধ্যয়ন ব্রত সিদ্ধ হয়। এই বেদাধ্যয়নের কি ফল হইবে, সে ফলশ্রুতি কথায় ব্যক্ত হইবার নহে। তাহার অনুষ্ঠান ভিন্ন সে ফল বিদিত হইবে না।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ কি প্রকার বেদ এবং ইহার ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম কেন? তাহার আলোচনা আবশ্যক। সকল বিষয়ে জ্ঞান সুস্পষ্ট হওয়া উচিত।

পরাশর বলিয়াছেন—

ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥

—ইহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রুতি ও স্মৃতি চির দিন সমান জাগ্রত থাকে না। তদুক্ত ধর্ম্মের তথ্য কালে কালে সমুদিত হয়। ভারতে আদিম কালের শ্রুতি ও স্মৃতির যদিও একান্ত বিলোপ হয় নাই, কিন্তু অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন দশা ঘটিয়াছিল। ভারতের রাজধানী এই কলিকাতায় নব্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সুশিক্ষিত যুবক তত্ত্ববোধের নিমিত্ত যে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, ধর্ম্ম বিষয়ে কোন স্থিরতা নাই। ধর্ম্মের নামে পৃথি-বীতে শান্তি অপেক্ষা অশান্তি অধিক ঘটি-য়াছে। আর ধর্ম্ম সম্পর্কে মনুষ্য মণ্ডলীর

মধ্যে ঐক্য ও সম্ভাবের কোন সম্ভাবনাই নাই। কারণ প্রসিদ্ধ আছে যে—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ,
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।

সুশিক্ষিতগণের এই তর্কের তরঙ্গে যখন বঙ্গদেশ ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সঙ্কট সময়ে বিধাতা শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মুখ হইতে এই পুরাতন শ্রুতি বাক্য সকল নির্গত করিলেন। শ্রীমন্মহর্ষি সমস্ত উপনিষদ্ যেমন পাঠ করিয়াছিলেন,তদুক্ত সার সার বাক্য সকল তাঁহার হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছিল। প্রতিবাদীরা ধর্ম্মের অনিশ্চিতত্তা প্রতিপাদন জন্য ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত করিলে সেই সকল অবিনশ্বর সত্যবাক্য তাঁহার জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তাহাই সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

ঈশ্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অথবা সমস্ত বঙ্গদেশের প্রতি এই যে কৃপা বর্ষণ করিলেন, অচিরকাল মধ্যে তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ। শ্রুতির অনুগত হইয়া স্মৃতি সকলও প্রকাশিত হইল। দুইখণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পূর্ণাকার ধারণ করিল। সংক্ষেপে ও সুবিস্তারে এই সকল মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। ইহাতে সহস্র সহস্র লোকের কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল। স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার উপযোগী এতাবৎ উপকরণ প্রাপ্ত হইয়া লোকের ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ হইল। বঙ্গদেশ প্রশান্ত হইল। এইরূপে নির্দ্বন্দ্ব নিঃসন্দেহ, তর্কাতীত, চির ক্রমাগত, বিশ্বাস্য, সুনিশ্চিতার্থ শাস্ত্র বাক্য সকল বঙ্গভাষার টীকা ও ভাষ্য সমেত এক গ্রন্থ-বদ্ধ হইল।

মনু সংহিতায় কথিত হইয়াছে,—শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতংধর্ম্মং ইত্যাদি (২।৯)অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিতে যাহা বিহিত, তাহাই ধর্ম্ম; তাহার আচরণ করিয়া মনুষ্য ইহ ও পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারেন। এই লক্ষণে শ্রুতি ও স্মৃতি মন্ত্রযুক্ত এই-গ্রন্থের 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নাম অবশ্যই সিদ্ধ বলিতে হইবে। ইহা ভিন্ন এতৎ প্রকৃতি-বাচক অন্য নাম হইতে পারে না।

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।

আদি কাল হইতে রচিত ও সঙ্কলিত কতশাস্ত্র এখনো বর্ত্তমান, তাহার অন্ত নাই। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ও উন্নতি আবশ্যক। নতুবা সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কার বিদূরিত হয় না। কাল স্বল্প; মনুষ্যের আয়ুকালের মধ্যে অতি অল্প কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে, অথচ বিঘ্ন বহু প্রকার; এই অল্প জীবন কালের মধ্যেও কি সকল সময়ে আমরা শাস্ত্র পাঠ করিতে সমর্থ হই? অতএব উপদেশ এইঃ—

যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং।

যাহা সারভূত সেই শাস্ত্রের চর্চ্চা করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের সঙ্কলন প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। এবং সেই কারণেই বঙ্গীয় সুশিক্ষিত যুবকেরা অতীব আগ্রহের সহিত তাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

যে উদ্দেশে এই গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল,তাহা সর্ব্বাংশে সফল বলিতে হয়। কিঞ্চিদূন পঞ্চাশ বৎসর এই গ্রন্থ উদিত হইয়াছে। তাহার সর্ব্বজনবোধগম্য সংক্ষিপ্ত অর্থ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দিগ্‌দিগন্তে সর্ব্ব শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার মতাবলম্বী লোকের গোচর হইয়াছে। কেহ সপক্ষভাবে, কেহ বিপক্ষভাবে, এই গ্রন্থের সূক্ষ্ম সমা-

লোচনাও করিয়াছেন। পরন্তু সর্ব্বমতের লোকের নিকট ইহার সমাদর হইয়াছে।

সম্প্রতি যাঁহারা সমগ্র বেদ বেদান্ত স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থকে হয়ত ক্ষুদ্র বলিবেন। যিনি কোন মত বিশেষের পক্ষপাতী, তিনি তাঁহার সেই মতটী ইহাতে পরিস্ফুট না দেখিয়া হয়ত ইহাকে অসম্পূর্ণ বলিবেন। কিন্তু সে দোষ পরিহার করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। সকল মতাবলম্বীর পক্ষে ঐক্য স্থল প্রদর্শন করা অথচ মনুষ্যের মুখ্য ধর্ম্ম ব্যক্ত করা, এই অমূল্য গ্রন্থের তাৎপর্য্য। গ্রন্থ প্রকাশের এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। ইহা যে সর্ব্ববাদিসম্মত, আত্মার তৃপ্তিকর, শান্তিপ্রদ গ্রন্থ এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ সৎপুরুষ দিগের অতি আদরের বস্তু, তাহা এই পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসেই অখণ্ডিত রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশবাসী, নানা ভাষায় পণ্ডিত, নানাধর্ম্মে দীক্ষিত, নানামতাবলম্বী ব্যক্তি, এই সর্ব্ব প্রাচীন ভাষার সর্ব্বপ্রাচীন মহাসার মহাবাক্যে পরিতৃপ্তিলাভ করিতেছেন, এবং চির দিন তাহা করিতে থাকিবেন।

যদি এই গ্রন্থের উদয় না হইত এবং ইহার সহিত অন্যান্য বহুল বেদবাক্যের অতি বিশদ মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে প্রকাশিত না হইত তাহা হইলে আজি বঙ্গীয় সমাজের ধর্ম্মালোচনার গতি কিরূপ হইত, তাহা অনুমান করা সুকঠিন। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের এই নবাভ্যুদয়ের ইতিহাস সম্যক আলোচনা করিবেন, তাঁহারাই এই তথ্য জানিতে পারিবেন।

পূর্ব্বের ব্রহ্ম সংসৎ এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজ রূপে পুনরাবির্ভূত। পূর্ব্বের শাস্ত্র সকলও এই প্রকারে পুনরুদিত। আমাদের যদি যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা জন্মে,—যদি আমরা এই ধর্ম্মগ্রন্থসমন্বিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য যথাবিধি সম্পাদন করিতে পারি, তবে সেই প্রাচীনকালের সত্য, সারল্য, ধ্যান, জ্ঞান ও ব্রহ্ম যোগ অচিরাৎ পৃথিবী মণ্ডলে পুনঃ পরিব্যাপ্ত হইবে। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ মস্তকে করিয়া আমরা দেশ দেশান্তরে, দ্বীপ দ্বীপান্তরে পিতৃ পুরুষদিগের পূজিত পবিত্র পরমেশ্বরের বন্দনা ও আরাধনা করিব। ঈশ্বরের প্রসাদ, আর্য্য ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদ সহকৃত হইয়া সর্ব্বত্রই আমাদিগের এবং লোক সাধারণের কল্যাণ সাধন করিবে।

প্রাচীন কাল হইতে শাস্ত্র সকল নানা রূপে গ্রথিত, নানা প্রকারে আহরিত এবং নানা ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এক এক শাস্ত্রের সকল বচন সেই শাস্ত্র-রচয়িতার হৃদয়স্ফূর্ত্ত নয়; বহু বাক্য শাস্ত্রান্তর হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। এক এক গ্রন্থের বাক্য লইয়া অন্য গ্রন্থ সঙ্কলন করা প্রাচীন রীতিসিদ্ধ বলিতে হইবে।

"অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

এই বাক্য যেমন কঠোপনিষদে, তেমনি গীতা গ্রন্থে অবিকল রহিয়াছে।

কঠ ২।১৮; গীতা ২।২০।

সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ ইত্যাদি ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত মন্ত্র উপনিষদেও অবিকল দৃষ্ট হয়।

'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং'।
"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং"।

ইত্যাদি বাক্য যেমন শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ-বচন তেমনি গীতার বচন বলিয়া গ্রথিত।

গীতা। ১৩।১৩।